# রঙিন ভূগোল-বিজ্ঞান স্বাস্থ্য-সমাজ



# রঙিন

# ভূগোল-বিজ্ঞান-স্বাস্থ্য-সমাজ

• দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য •



শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি



DNBA
ডিএনবিএ ব্রাদার্স
৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৬৭



মূল্য : এক টাকা ষাট পয়সা মাত্র

শ্রী অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ডিএনবিএ ব্রাদার্স-এর পক্ষে প্রকাশিত ও
জ্ঞানোদয় প্রেস ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ হতে মুদ্রিত॥

# সূচীপত্র

## প্রথম অধ্যায়

### ভূগোল-কথা





## দ্বিতীয় অধ্যায়

### প্রকৃতি-বিজ্ঞান-কথা

## তৃতীয় অধ্যায়

### স্বাস্থ্য-কথা



## চতুর্থ অধ্যায়

### সমাজ-কথা

## প্রথম অধ্যায়

# ভূগোল-কথা

## আমাদের পরিচয়

**বাঙালী**—আমরা পশ্চিমবাংলায় বাস করি। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমরা তাই বাঙালী। পশ্চিমবাংলা ভারতের একটা অংশ। আমরা তাই ভারতেরও অধিবাসী—ভারতবাসী। ভারত খুব বড় দেশ।

**বাঙালীর পোশাক**—আমরা এখন নানারকম পোশাক পরি। পুরুষদের মধ্যে অনেকে ধুতি, গেঞ্জি, চাদর, পাঞ্জাবী পরেন; অনেকে প্যাণ্ট, শার্ট, কোট পরেন; মুসলমানদের অনেকে আবার লুঙ্গি, পায়জামাও পরেন। মেয়েদের পোশাক হল শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া। ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছেলেরা হাফ প্যাণ্ট, শার্ট পরে; মেয়েরা পরে ফ্রক, ইজের, ইত্যাদি। জুতা পরে সকলেই।

**বাঙালীর প্রধান খাদ্য**—আমরা বাঙালীরা সাধারণত ভাত, মাছ, ডাল, তরিতরকারি, ঘি, দুধ খাই।

**শহর ও পাড়াগাঁ**—আমাদের দেশে শহরও আছে, পাড়াগাঁও আছে। তবে শহরের সংখ্যা খুব কম। পাড়াগাঁ অনেক বেশী। দেশের বেশির ভাগ লোকই পাড়াগাঁয়ে বাস করে।

শহর ও গাঁয়ে অনেক তফাৎ। তোমরাও এটা দেখলে বুঝতে

পারবে। শহরের ঘরবাড়ি, পথঘাট, যানবাহন আর লোকজন থেকে গাঁয়ের সবকিছু অনেক আলাদা।

## পাড়াগাঁয়ের পরিবেশ

**লোকজন**—পাড়াগাঁয়ে নানা লোক নানা কাজ করে। বেশির ভাগ লোক চাষবাস করে। তাদের বলে কৃষক বা চাষী। তা ছাড়া সেখানে আছে কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতী, ধোপা, নাপিত, শিক্ষক, ডাক্তার, গোয়ালা, ছুতোর, ব্যবসায়ী, দোকানদার প্রভৃতি।

গাঁয়ের লোক সাধারণত বেশ সরল ও সাদাসিধে হয়। তাদের সাজপোশাকও সাদাসিধে।



পাড়াগাঁয়ের দৃশ্য

**ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া**—পাড়াগাঁয়ে লোকজনের বসতি বা ঘর-বাড়ি সব ফাঁকা ফাঁকা, দূরে দূরে। বেশির ভাগ বাড়িতেই খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর বা টিনের ঘর। কোন কোন গাঁয়ে বেশ কিছু দালান-কোঠাও দেখা যায়।

বেশির ভাগ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। অনেক বড় বড়

গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়ও আছে। তা ছাড়া আছে মুদিখানা, খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, তাঁতশালা, কামারশালা প্রভৃতি।

**পথ-ঘাট, মাঠ, গাছপালা**—গাঁয়ের বেশির ভাগ পথ-ঘাট কাঁচা—মাটির তৈরী। অনেক গাঁয়ে পাকা সড়কও আছে। পাড়াগাঁয়ে গাড়ি-ঘোড়া খুবই কম চলাচল করে। হৈ-চৈ গোলমাল খুব কম।

পাড়াগাঁর দৃশ্য বড় সুন্দর—মনে হয় যেন ছায়ায় ঢাকা। সেখানে আছে আম, জাম, তাল, নারিকেল, সুপারি। আরও কত ফুল-ফলের বাগান, আর ধান, পাট, কলাই প্রভৃতি ফসল ও শাক-সবজির ছোট-বড় ক্ষেত। গাঁয়ের মাঠে গরু, মোষ, ছাগল চরে। গাছের ডালে ডালে ও বনে-জঙ্গলে কাক, শালিক, টিয়ে, বুলবুল, দোয়েল, ফিঙে, চিল, শকুন প্রভৃতি পাখি বাস করে। আর বনে-বাদাড়ে বাস করে শিয়াল, শুয়োর, খরগোশ, সজারু, সাপ প্রভৃতি নানারকম বুনো জীবজন্তু।

বর্ষাকালে গাঁয়ের পথে কাদা হয়, জায়গায় জায়গায় জল জমে। মাট-ঘাট, খাল-বিল, নদী-পুকুর, খানা-ডোবা—সব জলে ভরে যায়।

## শহরের পরিবেশ

**লোকজন**—শহরে খুব কম জায়গায় খুব বেশী লোক বাস করে। পাশাপাশি বাড়িতে একই পাড়ায় বাস করে শত শত লোক। সেখানে কেউ অফিসে-আদালতে, কেউ কল-কারখানায়, কেউ দোকানে-বাজারে চাকরি করে, কেউ বা আর কোনও কাজ করে। কেউ আবার কারবারও করে। শহরের লোক চালাক-চতুর। তাদের সাজ-পোশাকও নানা ধরনের। সেখানে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা অনেক বেশী।

**ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া**—শহরে ঘর-বাড়ি সবই প্রায় দালান-কোঠা—গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তৈরী। এখানে গাছপালা, মাঠ বা ফাঁকা জায়গা খুবই কম। বন-বাদাড়, ঝোপ-ঝাড় নেই। লোক-



শহরের দৃশ্য

জনের চেঁচামেচি, গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ, ইত্যাদি মিলিয়ে শহরে সব সময় হৈ-চৈ গোলমাল লেগে থাকে। বড় বড় শহরের পথ পাকা—পিচ-ঢালা, শান-বাঁধানো। বাস, মোটর, লরি, রিক্‌শা প্রভৃতি গাড়ি-ঘোড়া সব সময় যাওয়া-আসা করে। তা ছাড়াও কলকাতার রাস্তায় চলে ট্রাম গাড়ি। বড় বড় শহরে রাতের বেলায় পথে পথে আলো দেওয়া হয়, বিজলি বা গ্যাসের বাতি জ্বলে।

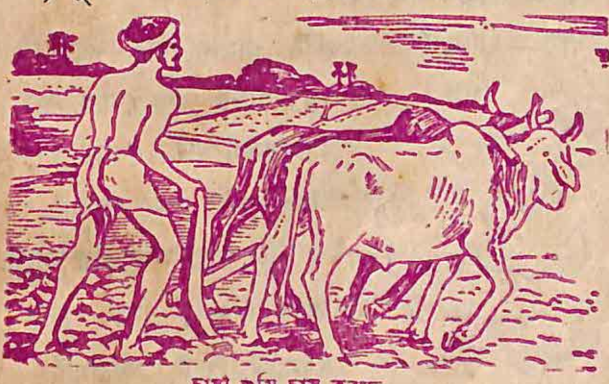
শহরে অনেক স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, দোকান-পসার, অফিস-আদালত প্রভৃতি আছে, বড় বড় কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অফিস আছে। আর কলকাতার মত বড় বড় শহরে ও তার চারপাশে আছে অসংখ্য ছোট-বড় কল-কারখানা। এখানে কলে বা যন্ত্রে দরকারী সব জিনিসপত্র তৈরী হয়।

লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কাজের প্রধান জায়গা হলো শহর। কাছের ও দূরের সব গ্রামের লোকদের এইসব কাজের জন্য শহরে আসতে হয়। মামলা-মোকদ্দমা অথবা অফিসে কাজকর্মের জন্যও অনেককে শহরে যাতায়াত করতে হয়।

## আমাদের পরিজন

আপনার জনকে বা নিজের লোককে বলে **পরিজন**। যারা পরিজন, তারা একে অপরকে নানাভাবে সাহায্য করে। বাবা, মা, কাকা, কাকীমা, মামা, মামী, দাদা, দিদি, ভাই-বোন—এঁরা সবাই আমাদের পরিজন। তবে এঁরা ছাড়াও ছোট-বড় নানা ধরনের আরো অনেক পরিজন আছে আমাদের। নানাভাবে তারা আমাদের উপকার করে। তারা কারা, জান?

তারা হলো চাষী, জেলে, গোয়ালা, ডাক-পিওন, মুদী, চৌকিদার, পুলিস—এই রকম আরও অনেকে।



চাষী জমি চাষ করছে

চাষী—আমরা ভাত, ডাল, শাক-সবজি, ইত্যাদি খাই। ভাত হয় চাল থেকে, আর ধান থেকে হয় চাল। তেমনি

কাপাস থেকে তৈরী হয় সুতো। সুতোর কাপড় আমরা পরি। চাষী অনেক কষ্ট করে মাঠে মাঠে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করে এবং ধান, ডাল-কলাই, শাক-সবজি, পাট, কাপাস, সরষে প্রভৃতি নানারকম ফসল ফলায়। চাষীকে সাধু ভাষায় বলে **কৃষক**।

**জেলে**—জেলে আমাদের মাছের জোগান দেয়। জাল, ছিপ-বড়শি, বেড় ইত্যাদি দিয়ে নানা কায়দায় সে নদী-নালা, খাল-বিল-পুকুর থেকে মাছ ধরে।

**কামার**—কামার ছুরি, কাঁচি, দা, কোদাল, কুড়ুল, লাঙলের লোহার ফলা প্রভৃতি তৈরি করে। শক্ত লোহাকে আগুনে পুড়িয়ে, পিটিয়ে, শান দিয়ে তারা তৈরি করে ঐসব জিনিস।

**গোয়ালা**—গোয়ালা বাড়িতে গরু পোষে। সেই সব গরুর দুধ সে আমাদের কাছে বিক্রি করে। গরুর দুধ খুব উপকারী। দুধ থেকে সে তৈরি করে দই, ঘোল, ছানা, ঘি, মাখন এবং আরও কত ভাল ভাল খাবার।

**কুমোর**—মাটির হাঁড়ি, কলসি, গামলা, সরা প্রভৃতি আমরা কুমোরদের কাছ থেকে পাই। এরা নানারকম মাটির খেলনাও তৈরি করে এবং পূজার সময় প্রতিমা গড়ে।



কুমোর হাঁড়ি গড়ছে

**ছুতোর**—ছুতোর কাঠের কাজ করে। কাঠ দিয়ে তারা দরজা-জানালা, খাট, আলমারি, টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি জিনিস তৈরি করে।

**মুদী ও দোকানদার**—চাল, ডাল, তেল, নুন, মরিচ, মসলা,

কাপড়-চোপড়, বই-খাতা, কাগজ-কলম, এমনি হাজার রকমের জিনিস আছে, যেগুলো না হলে আমাদের চলে না। এসব জিনিস আমরা পাই মুদী ও দোকানদারদের কাছ থেকে। শহর বা গঞ্জের বড় বড় দোকানদার বা মহাজনদের কাছ থেকে ঐসব জিনিস কিনে এনে গাঁয়েরমুদী ও দোকানদারেরা ওগুলো আমাদের কাছে বিক্রি করে।

**শ্রমিক বা মজুর**—হাজার হাজার শ্রমিক বা মজুর ছোট, বড়, মাঝারী আকারের মিলে বা কল-কারখানায় যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানা-রকম জিনিস তৈরি করে। তারা মাটি কাটে, পাহাড় ভাঙে, বড় বড় রাস্তা তৈরি করে; তারা খনি থেকে কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য তোলে; তারা বাস, লরি, ট্রেন, স্টীমার প্রভৃতি যানবাহন চালায়। এমনি আরও নানাভাবে তারা আমাদের সুখ, শান্তি, সুবিধা ও আনন্দের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে।



কারখানার মজুর



পুলিস

**পুলিস**—শহর হোক আর পাড়াগাঁ হোক, দেশের সব জায়গায় পুলিস আছে। দেশের লোকের যাতে বিপদ না ঘটে, চুরি-ডাকাতি, মারামারি, কাটাকাটি না হয়, পুলিসের কাজ সেদিকে নজর রাখা।

**চৌকিদার**—পুলিসকে সাহায্য করার জন্য গ্রামে গ্রামে থাকে চৌকিদার। পাড়ায় পাড়ায় সে চৌকি দেয়, তাই তাকে বলে চৌকিদার। গাঁ পাহারা দেওয়া, গাঁয়ের সব খবর রাখা, আর তা ঠিকমত থানায় দারোগা-পুলিসের কাছে পৌঁছে দেওয়া চৌকিদারের কাজ।

**ডাক-পিওন**—শহর ও পাড়াগাঁয়ে বহু ডাকঘর আছে। ডাকঘরের কাজ হলো—দেশের চিঠিপত্র নিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া, আর বিদেশের চিঠিপত্র এলে দেশের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।


ডাক-পিওন

বিদেশ থেকে আমাদের নামে ডাকঘরে চিঠিপত্র, টাকা-পয়সা আসে। ডাকঘর থেকে একজন লোক এসে সেইসব চিঠি ও টাকা-পয়সা আমাদের বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে যায়। আমরা তাকে বলি পিওন। পিওনের কাজ হলো—ডাকঘর থেকে চিঠিপত্র বা টাকা-পয়সা নিয়ে যথাস্থানে লোকের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া বা বিলি করা।

### অনুশীলনী

১। গাঁয়ের পরিবেশ ও শহরের পরিবেশের ভিতর তফাৎ দেখাও।
২। চাষী আমাদের পরিজন কেন? চৌকিদার, মুদী, গোয়ালা, জেলে, কামার, কুমোর, ছুতোর, পুলিস ও ডাক-পিওন, এরা কে কি কাজ করে?
৩। আমাদের এইরকম আরও দুইজন পরিজনের কথা বলতে পার কি?
৪। ভুল থাকলে ঠিক করো :—(ক) মুদী মাছ ধরে। (খ) কৃষক পাড়া চৌকি দেয়। (গ) চৌকিদার বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করে। (ঘ) পুলিস হাঁড়ি-কলসী তৈরি করে। (ঙ) ডাক-পিওন জমিতে ফসল ফলায়।

# যাতায়াতের ব্যবস্থা

আমাদের দেশে লোকজন যাতায়াতের ও মালপত্র আনা-নেওয়ার নানারকম ব্যবস্থা আছে।

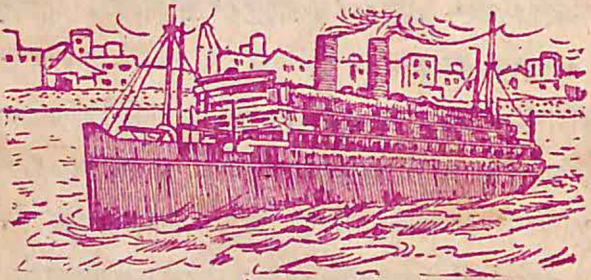
**স্থলপথ**—স্থলে বা ডাঙায় লোকজন ও গাড়ি-ঘোড়া চলাচলের জন্য যে সব রাস্তা আছে, সেগুলিকে বলা হয় স্থলপথ। এইসব পথে লোকজন মালপত্র নিয়ে হেঁটে যাতায়াত করে, তেমনি যাতায়াত করে গাড়ি-ঘোড়ায়। এইসব পথে চলাচল করে গরু বা মোষের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রিক্‌শা, সাইকেল, বাস, মোটর, লরি প্রভৃতি। রাস্তা ভাল বা পাকা না হলে বাস, মোটর, লরি প্রভৃতি চলতে পারে না। এ ছাড়াও ডাঙায় রেলগাড়ি ও ট্রামগাড়ি চলে। কিন্তু তারা যে কোন পথে—পাকা ভাল পথ হলেও—চলতে পারে না। এজন্য দরকার হয় বিশেষ ভাবে তৈরী পথ।

**জলপথ**—যে সব নদী, নালা ও সমুদ্র দিয়ে নৌকা, স্টীমার ও জাহাজ চলাচল করে, সেই সব পথকে বলা হয় জলপথ। নদীতে, খালে, বিলে ছোট ছোট নৌকা চলে। কোন কোন নদীতে চলে স্টীমার ও মোটরলঞ্চ। আর সমুদ্রে চলে জাহাজ।

**আকাশপথ**—স্থলপথ এবং জলপথ ছাড়াও শূন্য পথে আকাশ দিয়ে এখন লোকজন ও মালপত্র চলাচল করে। আকাশের যে পথ ধরে উড়োজাহাজ বা এরোপ্লেন বা বিমান চলাচল করে, সেই সব পথকে বলা হয় আকাশপথ বা বিমানপথ।

**স্টীমার**—কোন কোন নদীতে ভোঁ বাজিয়ে স্টীমার চলে। নৌকার চেয়ে স্টীমার অনেক বড়। এতে অনেক বেশী লোকজন

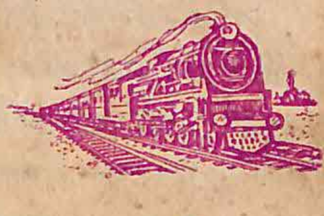
ও মালপত্র ধরে। বেশ কিছু দূর অন্তর নদীর ঘাটে স্টীমার-স্টেশন আছে। কিছু সময়ের জন্য স্টীমার সেখানে থামে। লোকজন,



স্টীমার

মালপত্র ওঠা-নামা করে। স্টীমার ইন্‌জিনে চলে। তাই চলেও অনেক জোরে—নৌকার চেয়েও অনেক জোরে। যেসব স্টীমার সমুদ্রপথে দূরদূর দেশে যাতায়াত করে, তাদের বলে **জাহাজ**।

**রেলগাড়ি**—মাটিতে পাতা রেলের উপর দিয়ে রেলগাড়ি চলে, চলে ইন্‌জিনে খুব জোরে—ঝড়ের বেগে, মাটি কাঁপিয়ে। এই পথকে বলে রেলপথ। স্টীমারের চেয়েও রেলগাড়ি জোরে চলে। গাড়ির বগিগুলি লোহার শিকল দিয়ে পর পর জোড়া থাকে। প্রত্যেক বগিতে দুই-তিনটি কামরা থাকে।



রেলগাড়ি

কামরাগুলো অনেকটা ঘরের মত। রেলগাড়িকে ট্রেনও বলে। স্টীমারের মত ট্রেনও স্টেশনে স্টেশনে থামে।



বাস

**বাস, লরি ও মোটর গাড়ি**—আজকাল পাড়াগাঁয়েও অনেক জায়গায়

**বাস** চলাচল করে। বাস চার চাকার। বহু লোকজন, মালপত্র নিয়ে **বাস** যাতায়াত করে।



মোটর গাড়ি

শুধুই মালপত্র নিয়ে যেসব মোটর গাড়ি চলাচল করে, তাদের বলে **লরি**। বাস বা লরির চেয়ে ছোট এক রকম **মোটর গাড়ি** আছে, তাতে করেও লোকজন যাতায়াত করে।

**উড়োজাহাজ**—বিমান বা উড়োজাহাজ আকাশপথে দেশ-বিদেশে যাওয়া-আসা করে। কয়েক শো মাইল দূরে দূরে উড়োজাহাজের স্টেশন আছে। সেগুলোকে বলে **বিমানঘাঁটি** বা **বিমানস্টেশন** বা **বিমান-বন্দর**। কলকাতার কাছে দমদমের বিমানবন্দর প্রসিদ্ধ।



উড়োজাহাজ

উড়োজাহাজ চলে ভীমবেগে ভীষণ গর্জন করে। রেলগাড়ি, বাস, স্টীমার প্রভৃতির চেয়ে উড়োজাহাজ অনেক বেশী জোরে চলে।

এসব ছাড়াও পাল্‌কি, ডুলি, রিক্‌শা, সাইকেল, মোটর সাইকেল, ট্রামগাড়ি, ইত্যাদি আরো নানারকম যানবাহন আছে।

## অনুশীলনী

১। যানবাহন কাকে বলে? তোমরা কোন্ কোন্ ধরনের যানবাহন দেখেছ বা সেগুলোতে চড়েছ?

২। কোন্ গাড়ির চলার পথ আলাদা ধরনের? সে পথকে কি বলে?

৩। ভুল থাকলে সংশোধন কর :—(ক) এরোপ্লেন নদীতে চলে। (খ) রেলগাড়ির চেয়ে নৌকা জোরে চলে। (গ) স্টীমার চলে পাকা রাজপথ বা সড়ক দিয়ে। (ঘ) নৌকা ইন্‌জিনে চলে। (ঙ) জাহাজ স্টীমারের চেয়ে আকারে ছোট। (চ) কয়েক শো মাইল দূরে দূরে রেলগাড়ির যেসব স্টেশন থাকে, তাদের বলে বিমানবন্দর।

## দরকারী জিনিসপত্র কোথায় তৈরী হয় এবং কোথা থেকে কিভাবে আসে ?

পাড়াগাঁয়ের মাঠে, বিলে ও বাগানে ধান, পাট, কাপাস, ডালকলাই, সরষে, হলুদ, লঙ্কা, কুমড়ো, বেগুন, ঝিঙে, আলু, পটল, কপি, মুলো প্রভৃতি ফসল ফলে। কৃষিকাজ বা চাষবাসের দ্বারা এইসব জিনিস উৎপন্ন হয়, তাই এদের বলে **কৃষিজাত** দ্রব্য। কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়াও গাঁয়ে মাছ, ডিম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়া গাঁয়ে আরো অনেক রকম জিনিস তৈরী হয়। খালি হাতে বা ছোটখাট যন্ত্রপাতির সাহায্যে ঘরে বসে জিনিসপত্র তৈরি করাকে বলে **কুটিরশিল্প**। কুটিরশিল্পের সাহায্যে গাঁয়ে তৈরী হয় নানা কাঠের জিনিস, তাঁতের কাপড়, মাটির হাঁড়ি, কলসি, গেলাস, পুতুল, লোহার দা, বটি, কুড়ুল, খন্তা, কোদাল, বেতের ঝুড়ি, পাখা প্রভৃতি।

আমাদের শহরে বন্দরে ছোট, বড় ও মাঝারী ধরনের নানা শিল্প-কলকারখানা আছে। সেখানে বড় বড় যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী হয় বইপত্র, কাগজ, কলম, কালি, কাপড়-চোপড়, জুতা, ছাতা, মোজা, গেঞ্জি, ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি, কাঠের ও লোহার ভাল ভাল আসবাব ও জিনিসপত্র, পাটের চট, থলে ও অন্যান্য জিনিস,

হারিকেন লণ্ঠন, টর্চলাইট, কাঁচের জিনিসপত্র, সাইকেল, মোটর, বাস, লরি, ইত্যাদি বহুরকম জিনিস। এইসব দ্রব্যকে **শিল্পজাত** দ্রব্য বলা হয়। তা ছাড়া মাটির নীচে খনি থেকে তোলা হয় কয়লা, লোহা প্রভৃতি। এদের বলে **খনিজ** দ্রব্য।

এইসব জিনিসপত্র আমাদের সব সময় দরকারে লাগে। তাই বিক্রির জন্য গাঁয়ের জিনিসপত্র শহরে আসে, আর শহরের জিনিস-পত্র গাঁয়ে যায়।

এই সব জিনিসপত্র পাঠানো হয় নানা উপায়ে। কাছাকাছি জায়গা হলে লোকে মাথায় বা বাঁকে করে, ঠেলাগাড়ি বা গরুর গাড়ি করে নিয়ে যায়। দূরের পথ হলে নৌকা, স্টীমার, জাহাজ, বাস, লরি, ট্রেন বা উড়োজাহাজে করে চালান দেওয়া হয়।

## পাড়া, গ্রাম, হাট-বাজার, থানা প্রভৃতির কথা

**পাড়া ও গ্রাম**—মানুষ একসাথে থাকতে ভালবাসে। তাই অতি নিকটজনেরা একসাথে দল বেঁধে এক বাড়িতে বাস করে। এদের বলে এক **পরিবার** বা একই পরিবারের লোক। এই রকম পাশাপাশি কতকগুলি পরিবার বা বাড়ি মিলে **পাড়া** হয়। যেমন—বোসপাড়া, কুমোরপাড়া, বামুনপাড়া, ইত্যাদি।

পাশাপাশি কয়েকটা পাড়া নিয়ে **গ্রাম** তৈরী হয়। যেমন—মহেশগ্রাম, রামপুর, পলাশডাঙ্গা, কালীগঞ্জ, ইত্যাদি।

**হাট-বাজার**—যেখানে বহু লোকজন জড়ো হয়ে দরকারী জিনিসপত্র বেচাকেনা করে, তাকে হাট বা বাজার বলে। একটা

গ্রামে কিংবা কয়েকটা গ্রামের মাঝখানে সুবিধাজনক জায়গায় হাট বা বাজার বসে।

**হাট ও বাজারে তফাৎ**—বাজার রোজ বসে, হাট রোজ বসে না। বাজারের চেয়ে হাটে লোকজন, মালপত্র অনেক বেশী আমদানি হয়।



বাজার

**হাটে-বাজারে মালপত্র আমদানি**—কাছের ও দূরের সব গ্রাম থেকে নানারকম জিনিসপত্র হাটে-বাজারে আসে বেচা-কেনার জন্য। ঐ সব জিনিস কেউ আনে মাথায় করে, কেউ আনে গরুর গাড়ি বা অন্য কোন গাড়িতে করে। নদী বা খাল থাকলে, নৌকায় করেও আনে অনেকে।

**থানা**—কতকগুলি গ্রাম নিয়ে একটি থানা গঠিত হয়। বিশেষ কোন গ্রামে থানার অফিস থাকে। থানার অধীনে যে সব গ্রাম থাকে, সেখানে যাতে কোন গোলমাল না হয়, সেদিকে নজর রাখা থানার কাজ। থানার প্রধান সরকারী কর্মকর্তার নাম বড়

**দারোগা**। বড় দারোগার অধীনে এক বা দুইজন ছোট দারোগা, কয়েকজন জমাদার এবং একদল পুলিস থাকে।

কয়েকটা থানা মিলে একটা **মহকুমা** হয়। মহকুমার প্রধান সরকারী কর্মকর্তাকে বলে **মহকুমা-শাসক**।

একটা বা একটার বেশি মহকুমা মিলে **জেলা** হয়। জেলার প্রধান শাসনকর্তার নাম **জেলা-শাসক**।

জেলার প্রধান শহরে জেলা-শাসক থাকেন। এই শহরকে বলে **জেলার সদর**।

### অনুশীলনী

১। পাড়া ও গ্রামে তফাৎ কি? হাট ও বাজারে কি তফাৎ? থানার পুলিস কার অধীনে কাজ করে?

২। মহকুমা কাকে বলে? তোমাদের জেলায় কয়টি মহকুমা? তাদের কি নাম? জেলা সদরের নাম কর। তোমাদের বাড়ি কোন্ থানায়?

৩। ভুল থাকলে সংশোধন কর:—(ক) কয়েকটা থানা মিলে গ্রাম হয়। (খ) থানার প্রধান কর্মকর্তার নাম পুলিস। (গ) কয়েকটা মহকুমা মিলে একটা থানা তৈরী হয়।

## নদী, হ্রদ, পাহাড়, ইত্যাদির কথা

আমরা মাটি বা জমির উপর বাস করি। জমির আর এক নাম ভূমি। ভূমি বা জমি সব জায়গায় একরকম নয়—কোন জায়গা সমান বা সমতল, কোন জায়গা উঁচু, কোন জায়গা নীচু।

**সমতল ভূমি**—যে জায়গা বেশী উঁচু-নীচু নয়, মোটামুটি সমান, তাকে সমতল ভূমি বলে। পশ্চিমবাংলার বেশির ভাগ জায়গা সমতল।

**পাহাড় ও পর্বত**—তোমরা হয়তো অনেকে পাহাড়-পর্বত দেখনি। মনে কর, কোন জায়গা অনেক এলাকা নিয়ে খুব উঁচু হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে,—দেখলে মনে হয়, যেন আকাশ ছুঁয়েছে। এই রকম জায়গাকে বলে **পর্বত**। ছোট ছোট পর্বতকে বলে **পাহাড়**। পাহাড়-পর্বতের মাথার সবচেয়ে উঁচু জায়গাকে বলে **চূড়া** বা **শৃঙ্গ**। দুই পাহাড় বা পর্বতশ্রেণীর মাঝের অঞ্চলকে বলে **উপত্যকা**।




সমতল জমি, পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা

পাহাড়-পর্বত পাথরের তৈরী—তৈরী হয়েছে আপনা থেকে, কেউ তৈরি করে নি। পশ্চিমবাংলার উত্তরে আছে হিমালয় পর্বত। পৃথিবীর মধ্যে হিমালয় পর্বত সবচেয়ে উঁচু। এত উঁচু যে, বারো মাস তার মাথা সাদা বরফে ঢাকা থাকে।

**পুকুর, দীঘি ও হ্রদ**—চারদিকে মাটি দিয়ে ঘেরা, তার মাঝখানে যে জল থাকে, তাকে বলে **পুকুর**। পুকুর মানুষে কাটে। দীঘি পুকুরেরই মত, তবে তার চেয়ে অনেক বড়। হ্রদ দীঘির চেয়েও বহুগুণ বড়। হ্রদ দুই রকমের : (১) কৃত্রিম বা মানুষের তৈরী এবং (২) প্রাকৃতিক বা আপনা থেকে তৈরী।

**দ্বীপ**—চারপাশে সবদিকেই জল, তার মাঝখানে যে স্থল বা ডাঙা, তাকে বলে দ্বীপ।

**নদী**—পাহাড়-পর্বত বা উঁচু জায়গা থেকে জল নেমে আসে নীচের দিকে। চলার পথে সেই জলের ধারা মাটিতে নালা কেটে এগোয়। আরও নানা জলের ধারা এসে তার সঙ্গে যোগ




নদী, উপনদী, শাখানদী ও মোহনা

দেয়। জলের ধারা ক্রমেই চওড়া হতে থাকে। শেষে নানা দেশ পার হয়ে সে কোন সাগরে বা আর কোন জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। এই জলধারার নাম **নদী**।

**খাল**—দেশের ভিতরকার অনেক সরু সরু নালা দিয়ে জল এসে নদীতে পড়ে। এইসব নালাকে বলে **খাল**। খাল একটু বেশী চওড়া হলে, তাকে আমরা নদীও বলি। খাল দুই রকমের—কোন খাল আপনা থেকে তৈরী হয়, কোন খাল আবার মানুষে কাটে।

**মোহনা**—নদী যেখানে এসে সাগর বা অন্য কোন জলাশয়ে মেশে, সে জায়গাকে বলে **মোহনা**।

**সাগর বা সমুদ্র**—মনে কর, এমন এক জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে আছ, যার সামনে শুধুই জল আর জল,—কোন মাটি নেই, কূল

নেই, কিনারা নেই, যেদিকে তাকাবে, দেখবে অথৈ জল আর বড় বড় ঢেউ। যেখানে এইরকম কূলকিনারাহীন বহুদূর জায়গা জুড়ে বিরাট জলরাশি থাকে, তাকে বলে **সাগর** বা **সমুদ্র**। সাগর খুব বড় হলে তাকে বলা হয় **মহাসাগর** বা **মহাসমুদ্র**।

### অনুশীলনী

১। নদী ও খালে কি তফাৎ? পর্বত, চূড়া ও উপত্যকা কাকে বলে?

২। ভুল থাকলে সংশোধন কর:—(ক) দীঘির চারদিকে থাকে জল। (খ) সরু সরু নালাকে নদী বলে। (গ) সাগরের তীরে দাঁড়ালে সামনে পর্বত দেখা যায়। (ঘ) পর্বত মানুষের তৈরী। (ঙ) পুকুর আপনা থেকে তৈরী হয়। (চ) দুই পর্বতের মাঝের অঞ্চলকে মোহনা বলে।

## দিক ঠিক করা



পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়াও

**দিক ঠিক করা**—সূর্য যে দিকে ওঠে, তাকে বলে **পূর্ব দিক**। পূর্ব দিকে মুখ করে দুই হাত দু পাশে সোজা টান করে দাঁড়াও। তোমার পেছন দিককে বলে **পশ্চিম দিক**। সূর্য ডোবে পশ্চিম দিকে। যে দিকে তোমার বাঁ হাত, তাকে বলে **উত্তর দিক**। আর যে দিকে তোমার ডান হাত, তার নাম **দক্ষিণ দিক**।

# রাত্রি ও দিনের বৈচিত্র্য

## সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত

**সূর্যোদয়**—তোমরা শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠলে দেখবে, রাতের গাঢ় আঁধার পাতলা হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে সব কিছু স্পষ্ট হচ্ছে, কালো পূব আকাশ ধূসর হয়ে আসছে।

**আকাশের রঙ**—দেখতে দেখতে ধূসর পূব আকাশ সাদা হয়। পূব দিকে লাল আভা নজরে পড়ে। পৃথিবীর সবাই তখন জাগছে। আঁধারের লেশ নেই কোথাও। ধীরে ধীরে লাল থালার মতো সূয্যিমামা উঁকি মারেন। সকাল হয় তখন।

**দিনের বৈচিত্র্য**—সকাল হতেই মানুষ, পশু-পাখি, যে-যার কাজে মন দেয়। ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে থাকে। দুপুরে সূর্য আসে মাথার উপর। তারপর ধীরে ধীরে সূর্য আবার নামতে থাকে পশ্চিম দিকে। দিন শেষ হয়ে আসে। সূর্য নামে পশ্চিম দিকে আরও নীচে। বিকাল হয় তখন।

**সূর্যাস্ত ঃ আকাশের রঙ**—সারা পশ্চিম আকাশ এবার লাল হয়ে ওঠে। দিনের কাজ সেরে মানুষ, পশু-পাখি সবাই ঘরে ফিরতে শুরু করে।

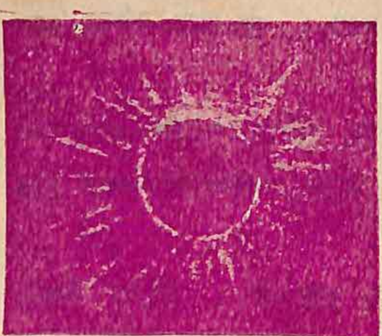
**রাত্রির বৈচিত্র্য**—তারপর সূর্য অস্ত যায়। সাঁঝের আঁধার নামে পৃথিবীর বুকে। কালো আকাশে অসংখ্য তারা দেখা দেয়, ঝিকমিক করে। গ্রাম ও শহরে আলো জ্বলে ওঠে। পাড়াগাঁয়ের বনে-জঙ্গলে শুরু হয় শিয়ালের একটানা ডাক। এবার নিশাচর পশু-পাখি বেরোয় শিকারের খোঁজে।

রাত বাড়তে থাকে। চারদিক নিঝুম হয়। সারা দিনের কাজের শেষে এবার সবাই বিশ্রাম নেয়—ঘুমোতে যায়।

## সূর্য, চন্দ্র ও তারকা

**সূর্য**—আমাদের এই পৃথিবী খুব বড়, তাই না? এত বড় যে, আমরা ঠিকমতো ধারণায় আনতে পারি না। কিন্তু সূর্য কত বড় জান? সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লাখ গুণ বড়; অর্থাৎ তের লাখ পৃথিবী একত্র করলে সূর্যের সমান হয়। অবস্থাটা ভেবে দেখ।

সূর্য আছে বহুবহু দূরে। তাই তাকে একটা ছোট থালার মত দেখায়। মনে কর, একটা গাড়িতে চড়ে আমরা সূর্যের দিকে রওনা হলাম। গাড়ি চলল একনাগাড়ে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে—এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও না থেমে। এইভাবে চললে সূর্যে পৌঁছাতে কত দিন লাগবে জান? দুশো বছর।



সূর্যের চারিধার

তবু কিন্তু সূর্যে পৌঁছানো যাবে না। কারণ সূর্য একটা বিরাট জ্বলন্ত আগুনের গোলা—দাউ দাউ করে জ্বলছে সব সময়। তার এত তাপ যে, মানুষ তো দূরের কথা, এত বড় এই পৃথিবীটা যদি তার কাছে যায়, চোখের পলকে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

**চন্দ্র বা চাঁদ**—চাঁদ কিন্তু একেবারে ঠাণ্ডা। চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের আলো তার গায়ে পড়ে। সেই আলো আবার ছিটকে বা ঠিকরে এসে পড়ে পৃথিবীর উপর। তাকেই রাত্রিবেলায় আমরা বলি চাঁদের আলো—**জ্যোৎস্না**।

চাঁদের আকার গোল। পৃথিবীর চেয়ে চাঁদ অনেক ছোট—পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। আকাশের চাঁদই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আছে—তু লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে।



কোন কোন রাতে চাঁদকে বড় গোল একখানা থালার মতো দেখায়। সে রাতকে বলে **পূর্ণিমা**। পূর্ণিমার পর থেকে চাঁদ ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে। এইভাবে চৌদ্দ রাত্রি ধরে সে ছোটই হয় কেবল। তারপর এক দিন তাকে আর দেখা যায় না। চাঁদশূন্য সেই আঁধার রাত্রিকে বলে **অমাবস্যা**। অমাবস্যার পরের রাত্রি থেকে চাঁদ আবার আকাশে দেখা দেয়। একটু একটু করে সে বড় হতে থাকে, তারপর আবার ফিরে আসে পূর্ণিমা রাত্রি।



**তারা বা নক্ষত্র বা তারকা**—রাত্রিবেলা আকাশে দূর মহাশূন্যে তারকার দল মিটমিট করে, ছোট ছোট হীরার টুকরোর মতো ঝিকমিক করে আকাশময়।

কিন্তু সত্যিই কি তারাগুলি এত ছোট ? মোটেই নয়। কোন কোন তারা সূর্যের চেয়েও কোটি কোটি গুণ বড়। কিন্তু ওরা এত দূরে আছে যে, সামান্য একটু আলো ছাড়া ওদের আর কিছুই দেখা যায় না। আমাদের সূর্যও কিন্তু একটি তারা বা নক্ষত্র।

**গ্রহ ও উপগ্রহ**—আমাদের মনে হয়, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তা কিন্তু ঠিক নয়। পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারদিকে।

সূর্যের চারদিকে যারা ঘোরে, তাদের বলা হয় **গ্রহ**। পৃথিবী একটি গ্রহ। বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি সূর্যের আরও গ্রহ আছে।

গ্রহের চারপাশে যারা ঘোরে, তাদের বলে **উপগ্রহ**। চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে, তাই চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ।

### অনুশীলনী

১। দিক ঠিক করার উপায় কি? দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়ালে কোন্ হাত কোন্ দিকে যায়?

২। সূর্যোদয়ের বর্ণনা দাও। রাত্রি ও দিনের মধ্যে পার্থক্য কি? সকাল ও সন্ধ্যায় কি তফাৎ, বল। সূর্যাস্তের সময় আকাশের রঙ কেমন হয়?

৩। ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে চললে সূর্যে পৌছাতে কত দিন লাগবে? সূর্যের কাছে যাওয়া যায় না কেন?

৪। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী—কে কার চেয়ে বড়?

৫। ভুল থাকলে সংশোধন কর :—(ক) পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডান হাত যাবে পূব দিকে। (খ) ভোর বেলায় পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে ওঠে। (গ) চাঁদ দাউ দাউ করে অবিরাম জ্বলছে। (ঘ) সূর্যের আলোকে বলে জ্যোৎস্না।

# দ্বিতীয় অধ্যায়





## প্রকৃতি-বিজ্ঞান কথা

### গাছপালার জীবন-কথা

আমাদের চারপাশে কত গাছপালা, লতাপাতা, কত ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল। আমাদের মতো এই সব গাছপালারও জীবন আছে।

**গাছের জন্ম**—মাটিতে বীজ পুতলে তার থেকে চারা গাছ বের হয়। চারা গাছ ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। গাছপালা জন্মাতে হলে ও তাদের বড় হতে ও বেঁচে থাকতে হলে, উপযুক্ত মাটি দরকার, আর দরকার উপযুক্ত জল, বাতাস ও আলো।

**সবজির চাষ**—সবজি-চাষের জন্য দরকার উচু জমি এবং উপযুক্ত মাটি। মাটি তিন রকমের—**বেলে মাটি, এঁটেল মাটি** আর **দো-আঁশ** মাটি।

বেলে মাটিতে বালির ভাগ বেশী থাকে। সে মাটি জল ধরে রাখতে পারে না, তাড়াতাড়ি গরম হয়। কাজেই গাছপালা দরকার মতো জল পায় না, শুকিয়ে যায়।

এঁটেল মাটিতে কাদার ভাগ বেশী থাকে। তাই সে মাটি জল বেশী ধরে রাখে। তার উপর আঠালো কাদার মধ্যে রোদ ও বাতাস সহজে ঢুকতে পারে না। ফলে অতিরিক্ত জল লেগে চারাগাছ পচে যায় বা মরে যায় বা তার ক্ষতি হয়।

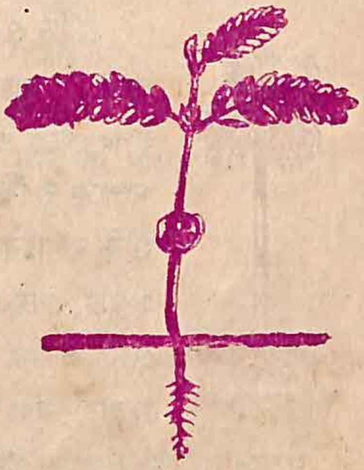
কিন্তু দো-আঁশ মাটিতে বালি ও কাদার ভাগ উপযুক্ত পরিমাণে থাকে। তাই দো-আঁশ মাটিই সবজি-চাষের পক্ষে উপযোগী। দো-আঁশ মাটিতে অতিরিক্ত জল দাঁড়ায় না, জল শুকায়ও ধীরে ধীরে। তার উপর রোদ ও বাতাস সে মাটির মধ্যে ঠিকমতো চলাচল করতে পারে। তার ফলে চারা গাছ এই মাটি থেকে দরকার মতো জল, রোদ ও বাতাস পেয়ে থাকে।

জল, বাতাস, সূর্যের আলো ও খাদ্য না হলে মানুষ বা পশুপাখি বাঁচতে পারে না। গাছেরও তেমনি ঐসব জিনিস দরকার। মাটিতে গাছের খাদ্য থাকে। গাছ সেই খাদ্য শিকড়ের সাহায্যে শুষে নেয়। বাতাসেও খাদ্য থাকে। গাছ তা শুষে নেয় পাতার সাহায্যে। তারপর এই সব খাবার সে সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজের মতো করে তৈরি করে নেয়, যাতে সহজে তা হজম করতে পারে। তাহলে দেখছো, উপযুক্ত মাটি, জল, বাতাস ও সূর্যের আলো না পেলে বীজ থেকে যেমন চারা গজায় না, তেমনি চারা গজালেও তা ভাল হয় না, আর তার ফলে সবজির চাষও ভাল হয় না।

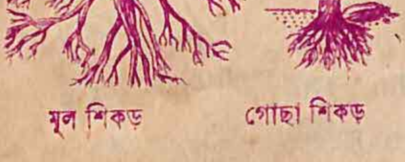
**গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ**—আমাদের মত গাছপালার শরীরেও নানা অংশ আছে। যেমন—শিকড়, গুঁড়ি বা ডাঁটা, পাতা, ফুল, ফল, ইত্যাদি।

একটা তেঁতুলের চারা উঠিয়ে আন। দেখবে, তার এক অংশ আছে মাটির নীচে, বাকিটা মাটির উপরে। গাছের যে অংশ মাটির নীচে থাকে, তাকে বলে **শিকড়**। মাটির উপরকার অংশকে বলে **গুঁড়ি** বা **ডাঁটা**। গুঁড়ি এবং ডালপালার গায়ে সাজান থাকে **পাতা** ও **ফুল**। ফুল থেকে হয় ফল।

**শিকড়**—আমরা দেখেছি, গাছপালার শিকড় থাকে মাটির নীচে। শিকড় আছে নানা রকমের। লক্ষ্য করলে দেখবে, কোন গাছের একটা শিকড় বেরোয়, কোন গাছের শিকড় বেরোয় এক গোছা।


তেঁতুলের চারা

ছোলা এবং ধানের দুটো চারা তুলে আন। দেখ, ছোলার চারার শিকড় একটা, ক্রমে সরু হয়ে মাটির ভিতর চলে গেছে। এই জাতীয় শিকড়কে বলে **প্রধান** বা **মূল শিকড়**। প্রধান শিকড়ের গা থেকে সরু সরু অনেক শিকড় বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আম, জাম, কাঁঠাল, তেতুল, বট প্রভৃতি গাছেরও প্রধান বা মূল শিকড় হয়।


মূল শিকড়     গোছা শিকড়

এইবার ধান-চারার শিকড় লক্ষ্য কর। দেখ, তার কোন প্রধান বা মূল শিকড় নেই, আছে ছোট একগোছা শিকড়। অনেকগুলো ছোট ছোট শিকড় মিলে **গোছা শিকড়** হয়। ধান গাছের মত গম, ভুট্টা, যব, পেঁয়াজ, আখ, বাঁশ, নারিকেল, সুপারি,

খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছের গোছা শিকড় হয়, তারা মাটির ভিতর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।


তালগাছ

**গুঁড়ি ও ডাঁটা**—মাটির উপরে গাছ দাঁড়িয়ে থাকে। তার মাথায় ডালপালা গজায়। মাটির উপর থেকে ডালপালার নীচে পর্যন্ত গাছের এই অংশকে **গুঁড়ি** বা **কাণ্ড** বলা হয়। নানা গাছের গুঁড়ি নানারকম। আম, জাম, তাল, নারিকেল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতি বড় বড় গাছের গুঁড়ি মোটা ও লম্বা হয়। তারা বেশির ভাগ হয় গোল ও শক্ত এবং মাটির উপর সোজা খাড়া থাকে।

লতানে গাছের কাণ্ডকে বলে **ডাঁটা**। ডাঁটা হয় নরম, সরু ও দুর্বল। লাউ, কুমড়া, শসা, ঘাস, শিম প্রভৃতি লতানে গাছের ডাঁটা তাই সোজাভাবে খাড়া থাকতে পারে না, লতিয়ে চলে।


লতা

**পাতা**—নানা গাছের পাতা হয় নানা রকম ঃ কোনটা লম্বা, কোনটা গোল, কোনটা ছোট, কোনটা বড়।

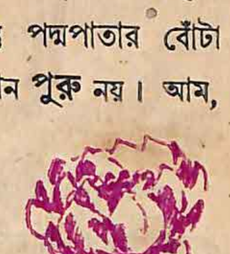
পাতা দেখে গাছ চেনা যায়। কুল ও পদ্মের পাতা গোল। টগর ও মাধবী গাছের পাতা ডিমের মতো। বাঁশের পাতা বল্লমের মতো। ধান, কাশ, যব, ভুট্টা, উলুখড় প্রভৃতির পাতা সরু তলোয়ারের মতো। কচুর পাতা তীরের ফলার মতো।

পাতার **ধার** বা **কিনারা** দেখলেও অবাক হতে হয়। কলা, আম, কাঁঠাল, পদ্ম প্রভৃতি পাতার কিনারা সরল—কোন খাঁজ নেই। কিন্তু জবা, গোলাপ প্রভৃতি পাতার কিনারায় খাঁজ আছে। পেঁপে, তাল, তরমুজ প্রভৃতি পাতার ধারের খাঁজ আরও বড়। দেবদারু পাতার ধার ঢেউ-খেলান। আনারস পাতার ধারে আর খেজুর পাতার আগায় দেখবে কাঁটা।



গোলাপ আম অশ্বত্থ পেঁপে

পাতার **বোঁটাও** হয় নানারকম। আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি পাতার বোঁটা থাকে তার গোড়ার দিকে। কিন্তু পদ্মপাতার বোঁটা আছে পাতার মাঝখানে। সব পাতা আবার সমান **পুরু** নয়। আম, বাঁশ প্রভৃতির পাতা পাতলা। কিন্তু পুই, পালং, কুমড়া, লাউ প্রভৃতির পাতা বেশ পুরু।



পদ্ম ফুল

**ফুল**—ফুল সবাই ভালবাসে। কোন ফুলের গন্ধ আছে। কোন ফুলের গন্ধ নেই। তাছাড়া এক এক রকম ফুলের গড়ন হয় এক এক রকম। কোন ফুলে পাঁচটি পাঁপড়ি, কোন ফুলে দশটি, কোন ফুলে আবার একটি।

রক্তজবা, শ্বেতজবা, পদ্ম, স্থলপদ্ম প্রভৃতি ফুলের অনেকগুলি পাঁপড়ি থাকে।

লাউ, কুমড়া, আকন্দ, ধুতুরা প্রভৃতি ফুলের বাইরে বেড় বা ঠোঙা থাকে একটা—সব একসঙ্গে জোড়া। তাদের পাঁপড়িগুলিও একসঙ্গে জোড়া থাকে এবং দেখতে হয় ঠিক চোঙার মত। কিন্তু গোলাপ, সরষে, মুলো প্রভৃতি ফুলের বাইরের বেড়টা একসঙ্গে জোড়া নয়—আলাদা আলাদা। পাঁপড়িও তাদের আলাদা, প্রত্যেক পাঁপড়ির বোঁটাও দেখবে আলাদা।


কুমড়ো ফুল

**ফল**—ফুল থেকে ফল হয়। কোন ফল মিঠা, কোনটা টক, কোনটা আবার তেতো।

ফল দেখবে দু-রকমের—**রসাল ও শুকনো**। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, পেঁপে, কলা, লেবু, বেগুন প্রভৃতি রসাল ফল। কারণ এদের ভিতরটা সব সময়ই রসাল থাকে।

কিন্তু ধান, কলাই, ভুট্টা, গম, যব, ছোলা, মটর, আকন্দ প্রভৃতি ফল পাকলেই তাদের খোসা শুকিয়ে যায়। তাদের খোসা হয় সাধারণত পাতলা ও নীরস। তাই তাদের বলে শুকনো ফল।

### অনুশীলনী

১। কোন্ মাটিতে গাছপালা ভাল হয় ? কেন হয় ? ঠিকমতো বাঁচতে হলে গাছপালার কোন্ কোন্ জিনিস দরকার ?

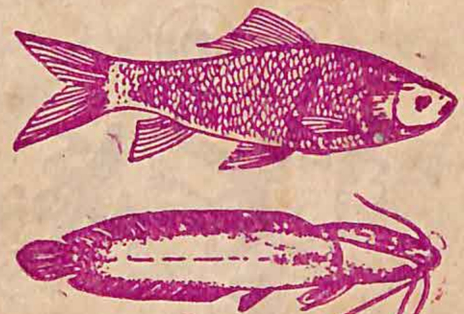
২। এঁটেল মাটি ও বেলে মাটিতে কি পার্থক্য ? কোন্ মাটি তাড়াতাড়ি গরম হয় ? কেন গরম হয় ?

৩। চারা গজাবার জন্য বীজের কি কি জিনিস দরকার ? গাছপালার শরীরে মোটামুটি কতগুলি অংশ আ[illegible]?

৪। প্রধান শিকড় ও গোছ[illegible]ড় পার্থক্য কি ? গুঁড়ি ও ডাঁটার পার্থক্য বল। বাঁশপাতা, কচুপাতা ও পেঁপেপাতায় কি পার্থক্য ? লাউ ফুল ও সরষে ফুলে তফাৎ কি ? ফল সাধারণত কয় রকম ?

## মাছ, ব্যাঙ, শামুক, সাপ ও শুঁয়োপোকার কথা

**মাছ**—মাছ জলে বাস করে। জল ছাড়া সে বেশী সময় বাঁচে না। সব জীবেরই শ্বাস নেবার জন্য বাতাস দরকার। মাছ নিশ্বাস নেয় কান্‌কো দিয়ে। জলে বাতাস মিশান থাকে। জল থেকে কান্‌কোর সাহায্যে মাছ সেই বাতাস টেনে নেয়।



কয়েকটি মাছ

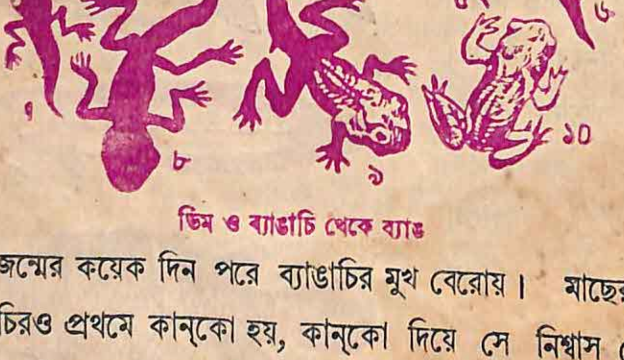
মাছ জলে ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। মাছের বাচ্চাকে বলে পোনা।

রুই, কাতলা, কই, ইলিশ প্রভৃতি মাছের গায়ে আঁশ থাকে। মাগুর, শিঙি প্রভৃতি মাছের গায়ে আঁশ থাকে না।

জলে সাঁতার কাটার জন্য মাছের ডানা আছে। রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছের ছখানি ডানা থাকে। কই মাছের ডানা আরও বেশী—তার পিঠ জুড়ে আগাগোড়াই প্রায় ডানা।

ব্যাঙ—ব্যাঙ জলে ও ডাঙায়, দু জায়গাতেই থাকে। ভারী অদ্ভুত তাদের জীবন।

মাছের মতো ব্যাঙেরও ডিম হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। ব্যাঙের বাচ্চাকে বলে ব্যাঙাচি। ব্যাঙাচি দেখতে প্রায় মাছের মতো। তখন তার গোটা শরীরটায় থাকে কেবল গোল একটা মাথা আর লম্বা একটা লেজ।




ডিম ও ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ

জন্মের কয়েক দিন পরে ব্যাঙাচির মুখ বেরোয়। মাছের মত ব্যাঙাচিরও প্রথমে কান্‌কো হয়, কান্‌কো দিয়ে সে নিশ্বাস নেয়। কয়েক দিন পরে তার পিছনের পা দুখানা বের হয়। চেহারা ক্রমেই ব্যাঙের মতো হতে থাকে। লেজ ছোট হতে হতে শেষে একদিন মিলিয়ে যায়। কান্‌কোও ঢাকা পড়ে। হঠাৎ একদিন

চামড়া ফেটে তার সামনের পা দুখানা বেরিয়ে আসে—ব্যাঙাচি হয় আসল ব্যাঙ। ব্যাঙ ডাঙায় উঠে আসে।

ব্যাঙের চার পায়ের আঙুলগুলো হাঁসের আঙুলের মতো পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। ব্যাঙ তাই সহজে সাঁতার কাটতে পারে।

মাছি, মশা, কেঁচো, পিঁপড়ে প্রভৃতি ব্যাঙের খাদ্য। তারা জিভ দিয়ে শিকার ধরে। ব্যাঙের জিভ বড় মজার। তার জিভের গোড়া থাকে সামনে, আর আগা থাকে মুখের ভিতরের দিকে—আমাদের ঠিক উল্‌টো। আঠালো একরকম জিনিস জিভের গায়ে লাগানো থাকে। শিকার দেখলেই ব্যাঙ মুখের ভিতর থেকে জিভের ডগাটা বাইরে ছুঁড়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আঠালো ডগায় শিকার আটকে যায়।



জিভ দিয়ে ব্যাঙের শিকার

ব্যাঙ সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়। তার সে সময়ের ঘুম সাংঘাতিক। মাথা থেঁৎলে গেলে বা হাত-পা ছিঁড়ে গেলেও সে ঘুম ভাঙে না।



শামুক

**শামুক**—শামুকের হাত, পা, ডানা কিছুই নেই। সারা শরীরে হাড়ও নেই, শরীরের উপর আছে শুধু মজবুত একটা খোলা।

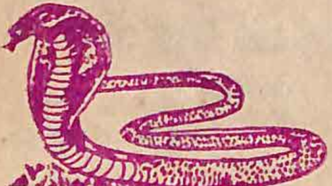
শামুক জলের ধারে সাদা সাদা ডিম পাড়ে। সেই ডিম

থেকে বাচ্চা হয়। বাচ্চা শামুকের দেহ যেমন বাড়ে, খোলাও বাড়ে তেমনি।

চলার সময় কোন বাধা পেলেই শামুক নিজের দেহটাকে খোলার মধ্যে টেনে নেয়। খোলার ভিতরে গিয়ে সে লুকোয়। শামুকের মুখ থাকে মাথার নীচে। তার দাঁত ভারী নরম। শীঘ্রই সেগুলো ক্ষয়ে যায়। কিন্তু পরে আবার মুখে নতুন দাঁত গজায়।

**সাপ**—সাপের পা নেই, তারা বুকে ভর দিয়ে চলে। তাদের রক্ত ঠাণ্ডা, তাই শরীরও ঠাণ্ডা। তাদের সারা গা আঁশে ঢাকা। আঁশগুলোর উপর খুব পাতলা স্বচ্ছ একটা চামড়া বা ছাল থাকে। তাকে **খোলস** বলে। খোলস পুরনো হলে, সাপ মাঝে মাঝে খোলস ছাড়ে। সাপের শরীর লম্বা ও প্রায় গোল। মাথার দিক মোটা, লেজের দিক ক্রমে সরু হয়ে গেছে।

সাপের চোখে পাতা নেই। তাই চোখে পলক পড়ে না। তাদের জিভ লম্বা ও সরু। আগা দু ভাগ করা।


সাপ—ফণী

সব সাপের ফণা নেই। যাদের ফণা আছে, তাদের বলে **ফণী**। সব সাপের বিষ নেই। **বিষধর** সাপের উপরের চোয়ালে ছোট দাঁত ছাড়াও দুটো ছুঁচলো বিষ দাঁত থাকে। এগুলো মুখের ভিতরের দিকে বাঁকানো।

সাপ খাবার গিলে খায়। ব্যাঙ, ইঁদুর প্রভৃতি সাপের খাদ্য। ময়াল, বোড়া প্রভৃতি অজগর জাতের বড় বড় সাপ সুযোগ পেলে ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতিও গিলে খায়।

সব জায়গায় সাপ দেখা যায়। তবে তারা সহজে লোকালয়ে আসে না। আমাদের মত গরম দেশে সাপ বেশী। অধিকাংশ বিষধর সাপও বাস করে গরম দেশে। আমাদের দেশে কেউটে, গোখরো, শাঁখিনী, কানন, শঙ্খচূড় প্রভৃতি সাপ বিষধর।



অজগর

সাপ মাটির নীচে গর্তের মধ্যে গরম জায়গায় ডিম পাড়ে। কিছুকাল পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

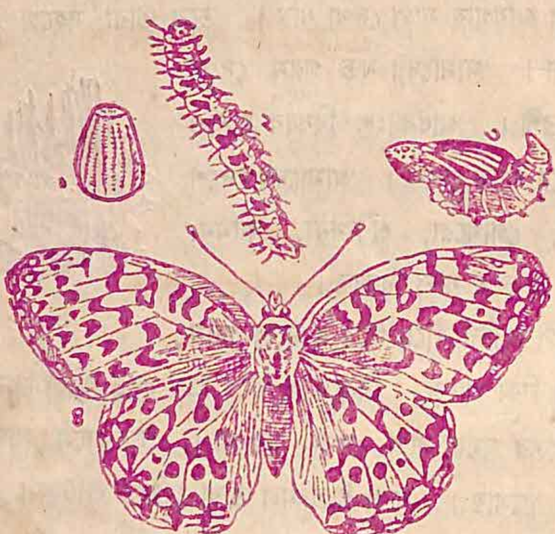
শীতের সময় সাপ দেখা যায় না। শীতকালে সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোয়। সারা শীতকাল তারা ঘুমিয়ে কাটায়। শীত চলে যেতেই তাদের ঘুম ভাঙে। তারা বেরোয় খাবারের খোঁজে।

**শুঁয়োপোকা**—শুঁয়োপোকা দেখতে ভারী বিশ্রী। কুৎসিত এই শুঁয়োপোকার জন্ম কিভাবে হয়, জান?

দিনে ও রাতে সুন্দর যেসব প্রজাপতি ও মথ উড়ে বেড়ায়, বেশির ভাগ শুঁয়োপোকাই সেই সব প্রজাপতি ও মথের বাচ্চা।

গাছের পাতায় বা সরু ডালে প্রজাপতি ও মথ সরষের মত বহু ছোট ছোট **ডিম** পাড়ে। কয়েক দিন পরে ডিম ফুটে বেরোয় **শুঁয়োপোকা**। জন্মেই সে ডিমের খোসাটা খেয়ে ফেলে, এবং দিনরাত গাছের পাতা খেয়ে খেয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ মোটাসোটা হয়ে পড়ে।

তারপর হঠাৎ একদিন তার খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়। মুখের লালা দিয়ে সে নিজের চারদিকে একটা খোলস বা গুটি তৈরি করে। তখন তাকে বলে **পুত্তলি**। এই সময় নানা রকম সব




১। ডিম ২। শুঁয়োপোকা ৩। পুত্তলি ৪। প্রজাপতি

অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার দেহের মধ্যে। তারপর একদিন গুটি কেটে বের হয় ডানাওয়ালা সুন্দর **প্রজাপতি**।

## অনুশীলনী

১। ব্যাঙের জীবন অদ্ভুত কেন? ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হয় কিভাবে? ব্যাঙ কেন সাঁতার কাটতে পারে? ব্যাঙ কিভাবে শিকার ধরে?

২। কি থেকে মাছের জন্ম হয়? মাছের বাচ্চাকে কি বলে? জলের মধ্যে মাছ কিভাবে বাঁচে?

৩। শামুকের শরীরে বিশেষ কি লক্ষণীয় জিনিস আছে? ভয় পেলে শামুক কি করে? দাঁত ক্ষয়ে গেলে শামুকের অবস্থা কি হয়?

৪। সাপ কিভাবে চলে ও কেন চলে? সাপের শরীর ঠাণ্ডা কেন? সাপের খোলস কাকে বলে? খোলস পুরনো হলে সাপ কি করে? সাপের জিভ ও চোখ কি রকম? ফণী ও বিষধর সাপ কাকে বলে?

৫। কারা সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়? তখন তাদের কি অবস্থা হয়?

৬। প্রজাপতির জন্ম-বিবরণ লেখ। শুঁয়োপোকা কিভাবে হয়?

# কয়েকটি পশুর কথা



আমরা বিড়াল, কুকুর, গরু প্রভৃতি নানারকম পশু পুষে থাকি। তাই এই সব পশুদের বলে **গৃহপালিত পশু**। শিয়াল প্রভৃতি যে সব পশু বনে বাস করে, তাদের বলা হয় **বন্য পশু**।

## গৃহপালিত পশু

**বিড়াল**—পোষা জন্তুদের মধ্যে বিড়াল সবচেয়ে আদুরে। বাঘের সঙ্গে তার চেহারার খুব মিল। বিড়াল ওস্তাদ শিকারী। ইঁদুরের উৎপাত থেকে সে আমাদের বাঁচায়।



বিড়াল

বিড়ালের মুখে গোঁফ আছে। তার সারা গা ও লম্বা লেজ পশমের মত নরম লোমে ঢাকা। প্রত্যেক পায়ের নীচেকার থাবা নরম মাংসের টিপি দিয়ে তৈরী; তাই হাঁটার সময়ে পায়ের কোন শব্দ হয় না। এই থাবার মধ্যে লুকানো থাকে ধারালো নখ। বিড়াল রেগে গেলে নখগুলি সব বেরিয়ে আসে।

রাত্রিবেলায় বিড়াল দেখতে পায়। অন্ধকারে তার চোখের মণি জ্বলতে থাকে। দুধ ও মাছ খেতে সে ভালবাসে।

**কুকুর**—কুকুরের মুখ সরু ও লম্বা। তার লেজ ও সারা গা লোমে ঢাকা। সে মাছ, ভাত, মাংস, ইত্যাদি খায়।

কুকুরের মত বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত জীব খুব কমই দেখা যায়। বুদ্ধিও তার খুব। মনিবের জন্য সে জীবন পর্যন্ত দেয়। সে দিনরাত আমাদের বাড়িঘর পাহারা দেয়।


কুকুর

অন্ধকারে তারও চোখের মণি জ্বলতে থাকে। রাত্রিতে তার ভয়ে চোর, শিয়াল প্রভৃতি বাড়ির কাছে ঘেঁষতে পারে না।

**গরু**—সব রকম খাদ্যের মধ্যে দুধই সবচেয়ে বলকারী। গরুই আমাদের সে দুধ দেয়। গরুর মত উপকারী জীব আর নেই। ক্ষীর, দই, ঘোল, ঘি, মাখন, ছানা, সন্দেশ প্রভৃতি নানারকম চমৎকার সব খাবার তৈরী হয় গরুর দুধ থেকে। গরুর গোবর ও চোনায় ভাল সার হয়। গরু লাঙল ও গাড়ি টানে। তার চামড়া, হাড়, খুর, শিং, ইত্যাদি থেকে তৈরী হয় নানারকম দরকারী দামী জিনিস।


গরু ও তার বাছুর

পুরুষ গরুকে **ষাঁড়** বা **বলদ** বলে, আর স্ত্রী গরুকে বলে **গাভী** বা **গাই**। গরু খুব শান্ত ও নিরীহ। তার মাথায় দুটো শিং। তার মুখ লম্বা। সারা গা লোমে ঢাকা। লোম আবার নানা রঙের হয়। গরুর লেজ লম্বা। গাভীর বাঁট চারটে। গরুর বাচ্চাকে বলে **বাছুর**।

## বন্য পশু

**শিয়াল**—পাড়াগাঁয়ে অনেক শিয়াল দেখা যায়। তারা বনে জঙ্গলে থাকে।



শিয়াল

শিয়াল লম্বায় আর উঁচুতে প্রায় কুকুরের মতো। তার মুখ সূঁচলো। মেটে মেটে লোমে সারা গা ঢাকা। লম্বা লেজটা ফোলান আর বড় বড় লোমে ঢাকা।

শিয়াল দেখতেও প্রায় কুকুরের মতো। কিন্তু কুকুর তার ঘোরতর শত্রু। দিনের বেলায় শিয়াল খুব বেশি দেখা যায় না। সে নিশাচর—রাতেই বের হয় শিকারের খোঁজে। শিয়াল ভারী চালাক। মাংস খেতে সে ভালবাসে। সুযোগ পেলেই তাই হাঁস, মুরগী, ছাগল-ছানা, ইত্যাদি নিয়ে চম্পট দেয়।

বাঘ—বাঘের চেহারা অনেকটা বিড়ালের মতো। তবে বিড়ালের চেয়ে সে অনেক বড়। বাঘ লম্বায় প্রায় ৬।৭ হাত হয় এবং উঁচু হয় দু হাতেরও উপর। তার গায়ের রঙ হলদে, তার উপর কালো কালো ডোরা; পেটের রঙ সাদা। অবশ্য কোন কোন দেশে এমন বাঘও আছে, যাদের চেহারায় ও গায়ের রঙে পার্থক্য দেখা যায়। বাঘের মুখে গোঁফ আছে।

বাঘ ভয়ঙ্কর জানোয়ার—ভীষণ হিংস্র। ছোট বড় কোন জন্তু-জানোয়ারই তার হাত থেকে রেহাই পায় না। তার দাঁতে ও

থাবায় ভীষণ জোর। থাবার এক আঘাতে বুনো মোষের মাথার খুলিও গুঁড়ো হয়ে যায়। তার গায়ে এত জোর যে, শিকার-করা গরু-মোষ পিঠে নিয়ে অনায়াসে সে ছোট ছোট খাল-নালা লাফিয়ে



বাঘ

পার হয়ে যায়। পশুদের মধ্যে বাঘই সবচেয়ে সাহসী। সে-ও অনেকটা নিশাচর প্রাণী। তবে সুযোগ পেলে দিনেও শিকার ধরে।

বাঘ জঙ্গলে থাকে। কাঁচা মাংস খায়। বাংলা দেশের সুন্দরবনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাঘ 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' বাস করে। তারা যেমন বড়, তেমনি সে ভয়ঙ্কর, দেখতেও তেমনি সুন্দর।

## পাখির কথা

বাংলাদেশের মাঠেঘাটে, বনেজঙ্গলে অসংখ্য পাখি বাস করে। আমাদের বাড়ির, আনাচেকানাচেও কত পাখি আসে।

**চড়াই**—চড়াই ছোট পাখি, বড় জোর পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা। তার ঠোঁট ছোট কিন্তু মজবুত। পায়ের আঙুল চারটে—তিনটে সামনের দিকে আর একটা পিছনে। প্রত্যেক আঙুলে নখ আছে। চড়াই খায় অনেক কিছুই—ধান, চাল, কলাই, ইত্যাদি।

চড়াই কখনও পোষ মানে না। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের আশেপাশে থাকতে সে ভালবাসে।

আমাদের ঘরের ভিতরে, কড়িকাঠের নীচে, দেওয়াল ও চালের ফাঁকে অথবা কাছাকাছি কোন জায়গায় সে বাসা বাঁধে। ঘাস, খড় প্রভৃতি দিয়ে বাসা তৈরি করে। সেখানে চড়াই একবারে তিনটে থেকে পাঁচটা ছাই রঙের ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে পরে ছানা বের হয়।



চড়াই

**কাক**—কাক দেখা যায় সব জায়গায়। কাকের গলার আওয়াজ ভারী কর্কশ। কাকের ঠোঁট কালো, মজবুত, লম্বা ও তীক্ষ্ণ। তার প্রত্যেক পায়ে চারটে করে আঙুল—সামনের দিকে তিনটে, পিছনে একটা।

কাক আছে মোটামুটি দুই রকমের—**পাতিকাক** ও **দাঁড়কাক**। পাতিকাকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। পাতিকাক আকারে ছোট। কিন্তু চালাকিতে তার জুড়ি মেলা ভার।

কাক খায় না, এমন জিনিস জগতে খুব কম আছে। ভাল বা নোংরা কোন জিনিসই তারা বাদ দেয় না।

পাতিকাক দল বেঁধে বাস করে। গ্রামের বাইরে নিরিবিলি জায়গায় এক একটা বড় গাছে এক এক দল কাক বাস করে।

ফাল্গুন মাস থেকেই তাদের বাসা বানাবার ধুম পড়ে। সেই বাসায় কাক তিনটে থেকে ছয়টা ডিম পাড়ে।



পাতিকাক

কাকের নিজেদের মধ্যে মিলমিশ ও একতা খুব বেশী। একটা কাক যদি বিপদে পড়ে তো, কাছাকাছি যেখানে যত কাক থাকে, সব সেখানে এসে জড়ো হয়, আর 'কা কা' রবে গলা ফাটায়।

**শালিক**—আমাদের বাড়ির উঠোনে, বাগানে, আনাচে-কানাচে শালিক চরে বেড়ায়। ছোট বেলায় পুষলে শালিক বেশ পোষ মানে এবং শিখালে মানুষের মতো কথা বলতেও পারে।



শালিক

তাদের শরীর কোথাও কালো, কোথাও সাদা, কোথাও বা গাঢ় খয়েরী রঙের। ঠোঁট, পা ও চোখের নীচেকার রঙ হলদে। তাই তাদের দেখতে মোটামুটি মন্দ নয়।

তাদের প্রধান খাদ্য পোকামাকড়। এ ছাড়া অন্য জিনিসও

তারা খায়। বৈশাখ থেকে আষাঢ়ের কিছু দিন পর্যন্ত তারা বাসা বাঁধে। সেই বাসায় শালিক তিন-চারটে ডিম পাড়ে।

**বাদুড়**—এমন একটা প্রাণীর নাম করতে পার কি, যে পাখি নয়, অথচ পাখির মত আকাশে ওড়ে ? সে হলো বাদুড়।

পাখির ডিম হয়, ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। কিন্তু বাদুড়ের ডিম হয় না—ছানা হয়। মায়ের স্তনের দুধ খেয়ে ছানারা বড়



বাদুড়

হয়। পাখির গায়ে পালক আছে, বাদুড়ের গায়ে পালক নেই—আছে পশুর মতো লোম। পাখির মতো বাদুড়ের ডানা আছে বটে, কিন্তু ডানায় পাখির মতো পালক নেই, পাতলা চামড়া দিয়ে তা তৈরী। পাখির দাঁত নেই, ঠোঁট আছে। কিন্তু বাদুড়ের দাঁত আছে, ঠোঁট নেই। তার মুখ সূঁচলো, প্রায় শিয়াল-কুকুরের মতো।

বাদুড় নিশাচর প্রাণী। সন্ধ্যা হতেই তারা শিকারের খোঁজে বের হয়। তারা ফল খেতে সবচেয়ে ভালবাসে। ছোট জাতের বাদুড় পোকামাকড়ও খায়।

বাদুড় দেড় ইঞ্চি, দু ইঞ্চি থেকে তের-চোদ্দ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা

হয়। চামচিকে আর বাদুড় একই জাতের। তবে চামচিকে বড় হয় না—ছোটই থাকে।

বড় বাদুড় দল বেঁধে এক একটা গাছে বাস করে। তারা বাসা তৈরি করে না। দু পায়ে ডাল আঁকড়ে মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুলতে থাকে। ঐ ভাবেই তারা ঘুমোয়, বিশ্রাম করে।

**অনুশীলনী**

১। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে কে আমাদের কি কি উপকার করে? কুকুর ও বিড়ালের চেহারায় তফাৎ কি? গরু কি কি উপকার করে?

২। দুইটি বন্য পশু ও কয়েকটি নিশাচর প্রাণীর বিবরণ দাও।

৩। কোন্ কোন্ পাখির মধ্যে মিলমিশ সবচেয়ে বেশী? কোন্ পাখি, সবচেয়ে বেশী চালাক? কোন্ পাখি পোষ মানে না, অথচ আমাদের আশেপাশে থাকতে ভালবাসে?

৪। বাদুড়ের সঙ্গে অন্য পশু-পাখির কি পার্থক্য? তারা কিভাবে ঘুমোয়?

# তৃতীয় অধ্যায়

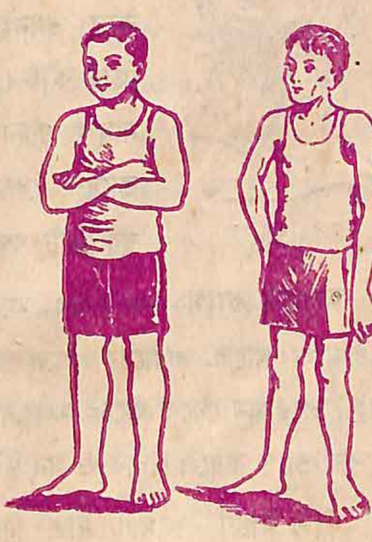
## স্বাস্থ্য-কথা

### গোড়ার কথা

আমরা সুখ চাই। আনন্দ চাই। আনন্দে লেখাপড়া ও খেলাধুলা করতে চাই। বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হতে চাই।

কিন্তু তা হতে গেলে, আমাদের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকা দরকার। তোমরা নিজেরাই দেখেছ, শরীর যদি ভাল না থাকে তো, কিছুই ভাল লাগে না।

যার শরীর নীরোগ ও সবল, যার স্বাস্থ্য ভাল, কাজ করে সে আনন্দ পায়। জীবনে সে সুখ পায়। তাই লোকে বলে, **স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।**

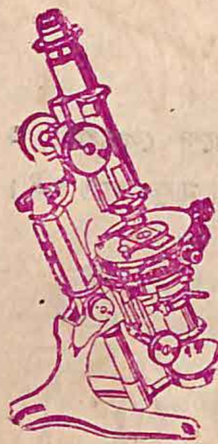


সুস্থ বালক     রুগ্ন বালক

কিন্তু শরীরের যত্ন না করলে, স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। তার জন্যে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা দরকার। যেমন—(১) **শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা,** (২) **উপযুক্ত আহার অর্থাৎ ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া এবং** (৩) **উপযুক্ত ব্যায়াম ও বিশ্রাম।**

# পরিচ্ছন্নতা

**জীবাণু**—সকলের আগে দরকার নিজের দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, শরীরের ভিতরে ও বাইরে যাতে কোন ময়লা না জমে, সেদিকে ঠিকমতো নজর রাখা। কেন জান? ময়লার মধ্যে নানা রোগের জীবাণু থাকে। সেই সব জীবাণু যখন শরীরকে আক্রমণ করে, তখনই রোগ হয়। জীবাণু হচ্ছে অতি ছোট কীট। এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র নামক একরকমের যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে তাদের দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে খুব ছোট সূক্ষ্ম জিনিসকেও বড় দেখায়।



অণুবীক্ষণ যন্ত্র

**মলমূত্র ত্যাগ**—মলমূত্রের মতো ময়লা জিনিস আর নেই, তার মধ্যে থাকে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নানারকমের জীবাণু। তাই ভোরে ঘুম থেকে উঠেই মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত। ভোরে মলমূত্র ত্যাগ করলে শরীর ও মন দুই-ই ভাল থাকে।

**দাঁত মাজা**—আমরা দাঁত দিয়ে যা চিবিয়ে খাই, তার কণা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকে। সেগুলি যদি পরিষ্কার করা না হয়, তবে তা পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়, আর তার মধ্যে নানা রোগের জীবাণুও জন্মে। তার ফলে দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হয়, পুঁজ পড়ে, নানা রোগ হয়। শেষে অকালে দাঁত পড়ে যায়। কাজেই রোজ দাঁত মেজে দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করা দরকার।

রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় তোমরা মাজন, বুরুশ বা দাঁতন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করবে। নিমের দাঁতন সবচেয়ে উপকারী। দাঁতনের একটা দিক তোমরা চিবিয়ে নিয়ে বুরুশের মতো করে দাঁতের উপর ঘষবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখবে,




ঘষার সময় দাঁতের গোড়া থেকে যেন রক্ত না বের হয়।

**স্নান**—শরীর পরিষ্কার রাখার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে নিয়মিত স্নান। আমাদের মাথার চুলের গোড়ায় ও গায়ের লোমের গোড়ায় ছোট ছোট যে গর্ত থাকে, তাকে লোমকূপ বলে। লোমকূপের ভিতর দিয়ে ঘাম বের হয়। ঘামের সঙ্গে শরীরের অনেক ময়লাও বের হয়ে আসে। তাই লোমকূপগুলিকে পরিষ্কার রাখা দরকার। সেইজন্য স্নানের সময় সারা শরীর ও মাথা ভালভাবে পরিষ্কার করবে।



লোমকূপ

**মাথা আঁচড়ান**—প্রতিদিন স্নানের পর চিরুনি দিয়ে ভাল করে মাথা আঁচড়ে ফেলা উচিত; তাতে চুল ও তার গোড়া সাফ হয়।

গায়ে ময়লা জমে লোমকূপগুলি বন্ধ হলে, দাদ, চুলকানি, খোসপাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ জন্মে।

মাথার চুলের গোড়া পরিষ্কার না থাকলে মাথায় মরামাস নামক চর্মরোগ হয় ও উকুন জন্মে।

তোমরা জান, চোখে পিঁচুটি, নাকে শিকনি, কানে খোল হয়। সেজন্য মাঝে মাঝে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে চোখ, নাক, কানের পাতা প্রভৃতি ভাল করে ধুয়ে ফেলবে, জল দিয়ে নাক ও নাকের ছেঁদা পরিষ্কার করবে, আর মাঝে মাঝে কানের খোল বের করে কান পরিষ্কার করবে।

## কয়েকটি বদ অভ্যাস

দাঁত দিয়ে নখ কাটা, যেখানে সেখানে থুতু, কফ বা শিকনি ফেলা বা জামাকাপড়ে শিকনি মোছা—এসব খুব খারাপ অভ্যাস।



নির্দিষ্ট স্থানে থুতু ফেলা

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নখের ময়লা পেটে গিয়ে পেটের অসুখ হয়। থুতু, কফ বা শিকনির সঙ্গে অনেক সময় নানা রোগের জীবাণু থাকে। সেই জীবাণু খাবারের সঙ্গে মিশে শরীরের মধ্যে ঢুকে নানা রোগের সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই থুতু, কফ প্রভৃতি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা অভ্যাস করা দরকার।

অনেকে হাঁ করে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেয়। এটা খুব খারাপ অভ্যাস। তোমরা মুখ বুজে নাক দিয়ে নিশ্বাস নেবে।

খালি পায়ে মাঠে খেলা করে বা ঘুরে এসে হাত, পা ও মুখ ভাল করে না ধুয়ে ঘরে বা বিছানায় বসা খারাপ অভ্যাস।

অনেক ছেলে থুতু দিয়ে শ্লেট মোছে। এটা ভারী বদ অভ্যাস। যখন তখন নাকে আঙুল দেওয়াও আর একটা নোংরা অভ্যাস।

কুঁজো হয়ে বসা, মেঝেতে বসে বইয়ের উপর ঝুঁকে বই পড়া কখনই উচিত নয়। তার ফলে পিঠের শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায়।



সোজা হয়ে বসা



সোজা হয়ে চলা

মেরুদণ্ড সোজা করে বসে লেখাপড়া করবে। দাঁড়াবেও সোজা হয়ে। আর চলার সময়ও চলবে সোজা হয়ে।

**কাপড়চোপড় ও বিছানা**—ময়লা কাপড়চোপড়, বিছানা প্রভৃতি ব্যবহার করলে, সেই নোংরা বা ময়লার সঙ্গে রোগের জীবাণু শরীরে ঢুকে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই এসব জিনিস পরিষ্কার রাখবে। লেপ, তোশক, বালিশ মাঝে মাঝে রোদে দেবে।

**বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা**—বাড়িঘরদোর সব সময় পরিষ্কার রাখা দরকার। রান্নাঘরের উনুনের ধোঁয়ায় কালি-ঝুল হয়। এই ধোঁয়া যাতে ঘরের বাইরে চলে যায়, সে রকম ব্যবস্থা থাকা দরকার।

শহরে যারা বাস করে, তাদের উচিত উনুনের ছাই, মাছের আঁশ, তরি-তরকারির খোসা প্রভৃতি আবর্জনা বাড়ির বাইরে জঞ্জাল ফেলার জায়গায় ফেলা। গ্রামে বাড়ি হলে তরকারির খোসা,



জঞ্জাল ফেলার জায়গায় আবর্জনা ফেলা

ভাতের ফেন প্রভৃতি গরুকে খেতে দেবে। অন্যান্য আবর্জনা বাড়ি থেকে বেশ দূরে নিয়ে ফেলবে।

সবচেয়ে নোংরা জায়গা পায়খানা। শহরে পায়খানা আছে প্রত্যেক বাড়িতে। সেগুলিকে মাঝে মাঝে ফিনাইল-জল দিয়ে ধোয়া দরকার। ফিনাইল জলে দুর্গন্ধও নষ্ট হয়, জীবাণুও মারা যায়।

গ্রামে পায়খানার সংখ্যা কম। অনেকেই সাধারণত মাঠ, নদী বা রাস্তার ধারে ঝোপেঝাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করে। সেগুলি সেখানেই জমে ও পচে। এটা অতি বিপজ্জনক ব্যাপার। তাই দেখা যায়,

গ্রামে কলেরা হলে, তা প্রায়ই ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, অনেক লোক মারা যায়।



গ্রামের ঘেরা পায়খানা।

বসবাসের ঘর এবং রান্নাঘর থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বড় গর্ত করে ও ঘিরে নিয়ে সেখানে পায়খানা করা উচিত। মলের উপর প্রত্যেকবার কিছু মাটি চাপা দিলে মল থেকে রোগ ছড়াবার ভয় দূর হবে। প্রস্রাবের জায়গাও একটু দূরে করা উচিত।

## অনুশীলনী

১। জীবনে আনন্দ ও সুখ পেতে হলে কি করা দরকার? ময়লার মধ্যে কি থাকে? প্রত্যহ ভোরে পায়খানায় যাওয়া প্রয়োজন কেন? দাঁত না মাজলে কি হয়? কি ভাবে দাঁত মাজা ভাল?

২। রোজ স্নান করা প্রয়োজন কেন? চর্মরোগ কাকে বলে? চর্মরোগ কেন হয়? মাথায় মরামাস বা উকুন কেন হয়?

৩। বদ অভ্যাসগুলি কি কি? তাতে স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি হয়? চলা, দাঁড়ান ও বসা কি ভাবে করা ভাল, আর কি ভাবে করা খারাপ?

৪। বাড়িঘর কি ভাবে পরিষ্কার রাখা দরকার? নোংরা আবর্জনা কি রকম জায়গায় ফেলা উচিত? গ্রামে পায়খানার কি রকম ব্যবস্থা ভাল?

## খাদ্য ও পানীয়

শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেই চলবে না, সেই সঙ্গে তোমাদের নজর দিতে হবে উপযুক্ত খাদ্য এবং জল, দুধ প্রভৃতি পানীয়ের উপর।

**হজম ও গুরু ভোজন**—প্রথমতঃ খিদে না পেলে খাবে না। তেমনি বেশি খাওয়াও অন্যায়। তাকে বলে গুরু ভোজন। গুরু ভোজনে সব খাদ্য ঠিকমত হজম হয় না। ফলে পেটের নানা রোগ হয়ে শরীরের ক্ষতি হয়।

**গুরুপাক খাদ্য**—এমন অনেক খাদ্য আছে, যেগুলো সহজে হজম হয় না। এগুলোকে বলে গুরুপাক খাদ্য। গুরুপাক খাদ্য খেলে পেটের নানা অসুখ হতে পারে। বেশী মসলা দেওয়া রান্না ভাল নয়। তা খেলেও পেট গরম হয়, হজমের গোলমাল হয়।

মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, সব জিনিসই টাটকা খাবে এবং রান্না হলে গরম অবস্থায় খাবে। তেল, ঘি খাঁটি না হলে খুবই খারাপ। দুধ খুব পুষ্টিকর খাদ্য। দই, ঘোল ও ছানা খুব পুষ্টিকর। টাটকা ফল খাওয়া খুব ভাল।

**বাজারের খাবার**—দোকানের খাবার যথাসাধ্য না খাওয়া উচিত। দোকানের খাবারে ভেজাল থাকে ও ময়লা থাকতে পারে।

অনেক সময় বাধ্য হয়ে দোকানের খাবার খেতে হয়। যে দোকানে কাঁচের আলমারীতে খাবার সাজানো থাকে, খাবারে ময়লা পড়তে পারে না, মাছি বসে না এবং দোকানী বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সেই দোকান থেকে খাবার কিনবে।

**জল**—আমরা পিপাসায় জল খাই। আমরা যে সব খাবার খাই, জল তা হজম করতে সাহায্য করে। কিন্তু অতিরিক্ত জল খাওয়া ঠিক নয়, পরিমিত জল খাওয়া উচিত। যখন তখন জল খেতে নেই। ভাত খাওয়ার কিছু পরে জল খাওয়া ভাল। না হলে হজমের ব্যাঘাত হয়।

রৌদ্রে পরিশ্রম বা দৌড়াদৌড়ি করে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কখনই জল খাবে না। তাতে সর্দিগর্মি হতে পারে। একটু বিশ্রাম নিয়ে, তারপর জল খাবে।

**পরিস্রুত জল**—জীবাণুমুক্ত, ময়লাহীন ও বিশুদ্ধ পানীয় জলকে বলে পরিস্রুত জল। কলিকাতায় বা মফঃস্বলের কোন কোন শহরে কলের জল সরবরাহ করা হয়। সে জল পরিস্রুত। লোকে টিউবওয়েল বা নলকূপ, পাতকুয়ো, ইঁদারা প্রভৃতির জলও ব্যবহার করে।

**টিউবওয়েল, ইঁদারা ও পাতকুয়ো**—টিউবওয়েল, ইঁদারা বা পাতকুয়ো যথেষ্ট গভীর হওয়া দরকার। গভীর টিউবওয়েলের জল বিশুদ্ধ।

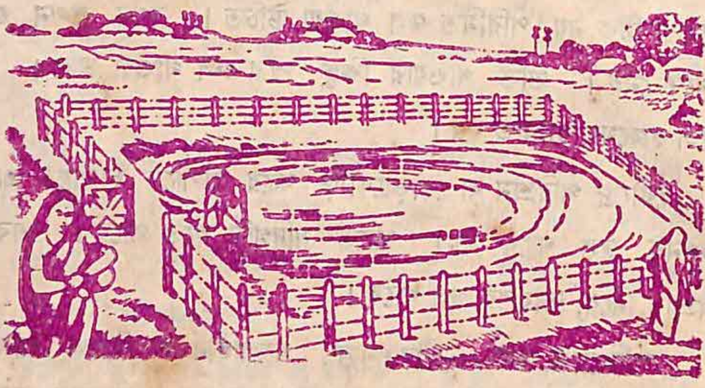


টিউবওয়েল

ইঁদারা বা কুয়োর চারদিক পরিষ্কার এবং মুখ ঢেকে রাখবে। নয়তো উপর থেকে নানা ময়লা ভিতরে পড়তে পারে।

**পুকুর**—খাবার জলের পুকুর আলাদা থাকা উচিত। সে পুকুরের চারদিকে উঁচু পাড় থাকবে, যাতে বাইরের নোংরা জল

বা ময়লা পুকুরে এসে পড়তে না পারে। ঐ পুকুরে স্নান করা বা অন্য কোনভাবে জল ময়লা করা নিষেধ থাকবে।



খাবার জলের পুকুর

তবে কুয়োর জলই হোক আর পুকুরের জলই হোক, সব সময় তা আগুনে ফুটিয়ে বিশুদ্ধ করে নেবে। আগুনে ফুটিয়ে নিলে জলের জীবাণু মরে যায়।

## অনুশীলনী

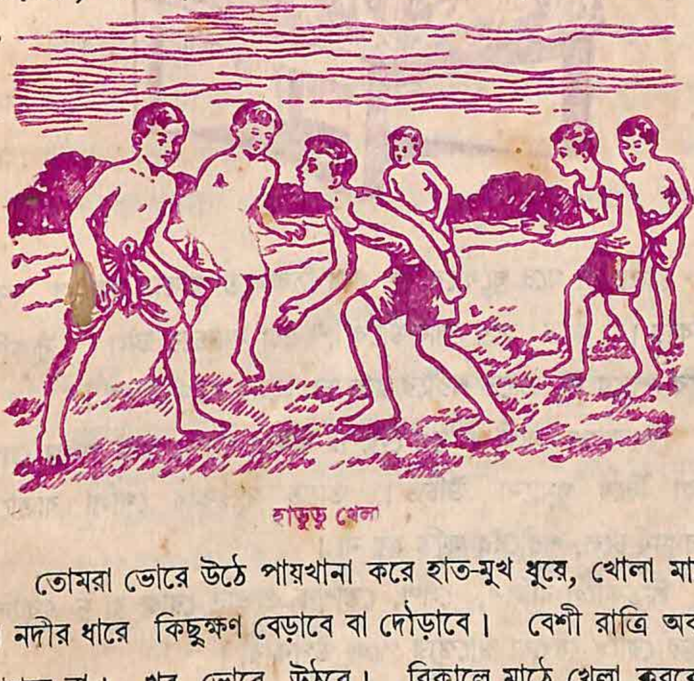
১। কি রকম খাদ্য খাওয়া উচিত? গুরুপাক খাদ্য কাকে বলে? বদ হজম হলে কি ক্ষতি হয়? বাজারের খাবার খাওয়া ভাল নয় কেন?

২। কি রকম জল পান করা উচিত? রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি বা পরিশ্রম করে এসে জল খাওয়া ভাল নয় কেন? কুয়ো, ইঁদারা বা খাবার জলের পুকুর কিভাবে রাখা উচিত? কেন? কেমন হওয়া উচিত?

## ব্যায়াম ও বিশ্রাম

স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়মিত চালনা করাকে ব্যায়াম বলে। উপযুক্ত ব্যায়ামে দেহে রক্ত চলাচল ভাল হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবল ও শক্ত হয় এবং হজম ভাল হয়।

**ছোটদের ব্যায়াম**—তোমাদের উপযুক্ত ব্যায়াম হলো হাঁটা, দৌড়ানো, লাফানো, সাঁতার কাটা ও নানা খেলাধুলা প্রভৃতি।

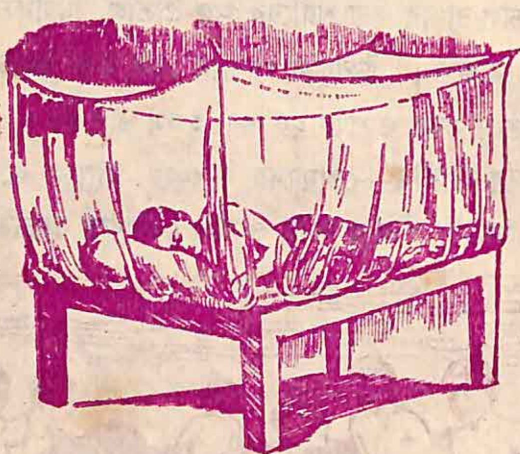


হাডুডু খেলা

তোমরা ভোরে উঠে পায়খানা করে হাত-মুখ ধুয়ে, খোলা মাঠে বা নদীর ধারে কিছুক্ষণ বেড়াবে বা দৌড়াবে। বেশী রাত্রি অবধি জাগবে না। খুব ভোরে উঠবে। বিকালে মাঠে খেলা করবে। যে খেলাতে দৌড়াদৌড়ি আছে, সেই খেলাই ভাল।

**বিশ্রাম**—ব্যায়াম, খেলাধুলা বা কোন পরিশ্রমের পর শরীর ক্লান্ত হয়। তখন বিশ্রাম করা দরকার।

**নিদ্রা বা ঘুম**—ঘুম আমাদের একান্ত দরকার। রাত্রে পুরো ঘুমের পর সকালে শরীর বেশ সুস্থ, সতেজ ও সবল বোধ হয়।



কাত হয়ে সোজাভাবে শোওয়া

রাত্রে যে ঘরে ঘুমোবে, সে ঘরে ঠিকমতো বাতাস চলাচল করা দরকার। কাত হয়ে সোজভাবে শোওয়া সবচেয়ে ভাল। কুঁকড়ি মেরে শোবে না, তাতে শরীরে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয়।

শীতকালে মাথা ও মুখ লেপের বাইরে রেখে, গলা পর্যন্ত লেপ ঢাকা দিয়ে ঘুমানো উচিত। তাতে পরিষ্কার খোলা বাতাসে শ্বাসকার্য চলে, শরীরের ক্ষতি হয় না।

শীতকালে বালিশ, লেপ, তোশক প্রভৃতি রোজ বা দু-একদিন অন্তর রোদে দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

## বাতাস ও রোদের উপকারিতা

**বায়ু বা বাতাস**—বায়ু আমাদের একান্ত দরকার। বাতাস ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কিন্তু সেই বাতাস যদি অপরিষ্কার

হয়, তাহলে তা মারাত্মক হয়। নোংরা দূষিত বায়ু আমাদের রক্তকে দূষিত করে। তাই বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য দরকার।

**রোদ**—রোদের উপকারিতা যে কত, তা বলে শেষ করা যায় না। ভিজে স্যাঁতসেঁতে জিনিস বা জায়গা রোদে শুকিয়ে যায়, অনেক রকম রোগের জীবাণু ধ্বংস হয়। নোংরা, ময়লা, পচা আবর্জনা থেকে যে বিষাক্ত গ্যাস জন্মে, রোদ সেগুলি নষ্ট করে।

বাতাসে সূক্ষ্ম ধুলোর কণা থাকে, দূষিত গ্যাস থাকে, কত রকম রোগের জীবাণু থাকে। রোদ বাতাসের এই সব দূষিত গ্যাস ও জীবাণু ধ্বংস করে এবং বাতাসকে বিশুদ্ধ করে। এই জন্যই খোলা আলো-বাতাসে বসবাস করলে লোকে নীরোগ ও সুস্থ থাকে।

### অনুশীলনী

১। ব্যায়াম কাকে বলে? ব্যায়াম করলে কি হয়? ছোটদের কয়েকটি ব্যায়ামের নাম কর। কোথায় কি ভাবে বেড়ান ভাল?

২। বিশ্রামের প্রয়োজন কি? নিদ্রার প্রয়োজন কি? কি ভাবে কোথায় নিদ্রা যাওয়া উচিত?

৩। রোদের উপকারিতা কি? বায়ু দূষিত হলে কি হয়?

## কয়েকটা সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার

**সর্দি-কাশি**—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে বা বেশী ঠাণ্ডা লাগলে সর্দি-কাশি হয়। সেজন্য খালি গায়ে থেকে ঠাণ্ডা লাগাবে না। জলে বেশী সময় থাকবে না বা বৃষ্টিতে ভিজবে না।

**ম্যালেরিয়া জ্বর**—এক জাতের মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ম্যালেরিয়ার জীবাণু মারার ঔষধ হচ্ছে কুইনাইন। যে অঞ্চলে ম্যালেরিয়া হয়, সেখানে নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একটা-দুটো করে কুইনাইনের বড়ি খেলে সহজে ম্যালেরিয়া ধরতে পারে না।

পচা পুকুর, খানা, ডোবা প্রভৃতি হচ্ছে মশার জন্মস্থান। এই সব পচা খানা, ডোবায় কেরোসিন তেল ঢেলে দিলে ঐ সব মশার ডিম বা বীজ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা পড়ে। খানা, ডোবাগুলি মাটি দিয়ে ভরাট করে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। তা হলে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর হবে। রাত্রে মশারির ভিতর শোওয়া উচিত। তাহলে মশা কামড়াতে পারবে না এবং ম্যালেরিয়া রোগীর দেহ থেকে ম্যালেরিয়ার জীবাণু নিয়ে আর একজন সুস্থ লোকের দেহে ঢুকিয়ে দিতে পারবে না।

**ইনফ্লুয়েঞ্জা**—ইনফ্লুয়েঞ্জা ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগে জ্বরের সঙ্গে সর্দি-কাশি এবং সর্বাঙ্গে বেদনা থাকে। রোগীর শ্বাস বা কফের সঙ্গে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। কারো ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে, তাকে আলাদা করে রাখা উচিত। রোগীর জামাকাপড় প্রভৃতি রোজ সাবান দিয়ে ধুয়ে দেবে। বিছানাও রৌদ্রে দেবে।

**টাইফয়েড**—টাইফয়েডও ছোঁয়াচে ও খারাপ রোগ। টাইফয়েডের রোগীকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখবে, মলমূত্র একটি গর্তের ভিতর ফেলে তাতে খানিকটা ব্লিচিং পাউডার ঢেলে দেবে। রোগীর বিছানাপত্র রোজ রৌদ্রে দেবে বা গরম জলে ধুয়ে দেবে।

বাড়িতে বা পাড়ায় কারো টাইফয়েড হলে, সকলে টাইফয়েড-নিবারক ইনজেকশন নেবে এবং জল ফুটিয়ে খাবে।

**চর্মরোগ**—চুলকানি, খোস-পাঁচড়া, এই সব হচ্ছে ছোঁয়াচে চর্মরোগ। খোস-পাঁচড়ায় গায়ে ব্যথা হয় আর খুব চুলকায়।

কারও খোস-পাঁচড়া হলে, তার কাছ থেকে দূরে থাকবে। তার ব্যবহৃত বিছানা, কাপড়চোপড়, গামছা প্রভৃতি ব্যবহার করবে না। খোস হলে স্কুলে যাবে না। চালমুগরার তেল বা নিমতেল মাখলে এ রোগ সারে। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে, গা পরিষ্কার রাখলে, চর্মরোগ হয় না।

**কলেরা**—কলেরা ছোঁয়াচে ও মারাত্মক রোগ। কলেরা হলে বারবার খুব পাতলা জলের মতন দাস্ত আর বমি হয়। রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। হাতে-পায়ে সাংঘাতিক খিল ধরে। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না করালে রোগী মারা যায়।

রোগীর দাস্ত ও বমির মধ্যে কলেরার রোগবীজ থাকে অসংখ্য। তাতে মাছি বসলে, তার পায়ে জীবাণু লেগে যায়। সেই মাছি অন্য জায়গায় খাদ্যে গিয়ে বসলে, সেই সব খাদ্যেও কলেরার রোগবীজ লেগে যায়। সে খাদ্য যে খায়, তারও কলেরা হয়।

সেইজন্য রোগীর দাস্ত আর বমি সঙ্গে সঙ্গে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। রোগীর কাপড়চোপড় পুড়িয়ে ফেলবে। অথবা

জলে কলেরার জীবাণুনাশক ঔষধ মিশিয়ে সেই জলে ঐ সব কাপড়চোপড় সিদ্ধ করে নেবে।

যেখানেই একজনের কলেরা হবে, সেখানে সকলে কলেরা-নিবারক ইনজেকশন নেবে, তাহলে কলেরা হওয়ার ভয় থাকবে না।

**বসন্ত**—বসন্তও অতি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। এতে রোগীর সর্বাঙ্গে মুসুরির মতো গুটি ওঠে আর বেদনা হয়। কয়েক দিন পরে সেইসব গুটি পাকে ও পুঁজ হয়। বেদনায় রোগী নিদারুণ যন্ত্রণা পায়।

বসন্ত রোগীর পুঁজে জীবাণু থাকে। তাই রোগীর জামা-কাপড় পুড়িয়ে ফেলা উচিত। বসন্তের গুটিগুলি শুকোতে



এরা বসন্তের টিকা নিচ্ছে

শুরু করলে, তার খোসায় রোগবীজ থাকে এবং তা বাতাসে উড়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করে। কাজেই খোসাগুলি রোগীর গা থেকে তুলে একত্র করে আগুনে পুড়িয়ে

ফেলা দরকার। তাছাড়া, বসন্ত রোগীকে বাড়ির অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে সবসময় মশারির মধ্যে রাখবে। তাহলে রোগবীজ ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না।

আগেই বসন্তের টিকা নিলে, বসন্তের ভয় বিশেষ থাকে না।

আসল বসন্ত রোগ ছাড়াও আর এক রকমের বসন্ত আছে। তাতে গুটির মধ্যে পুঁজের বদলে জল হয়। তাই তাকে **জলবসন্ত** বা **পানিবসন্ত** বলে। আসল বসন্তের মতো তা মারাত্মক নয়। তবু আসল বসন্ত হলে আমরা যেমন সতর্ক হই, এ রোগের বেলায়ও তেমনি হওয়া দরকার।

**হাম**—হাম ছোঁয়াচে রোগ। ছোট ছেলেমেয়েদেরই হাম রোগ হয়। প্রথমে সর্দিজ্বর হয়, গায়ে ব্যথা হয়, তারপর গায়ে ঘামাচির মতো ছোট ছোট লাল দানা দেখা দেয়। বাতাসে এ রোগের জীবাণু ছড়ায়। সুতরাং সতর্ক থাকা দরকার।

### অনুশীলনী

১। সর্দি-কাশি কেন হয়? চর্মরোগের বিরুদ্ধে কিভাবে সাবধান থাকা উচিত?

২। মশারির উপকারিতা কি? ম্যালেরিয়া কেন হয় ও কিভাবে ছড়ায়? তার ওষুধ কি? দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করার উপায় কি?

৩। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ কি? এ রোগ কিভাবে ছড়ায়? টাইফয়েড রোগ হলে কি ভাবে সাবধান হওয়া উচিত?

৪। কলেরা হলে রোগীর কি অবস্থা হয়? এ রোগ কিভাবে ছড়ায়? কলেরার বিস্তার রোধ করতে হলে কি করা উচিত?

৫। বসন্ত রোগের লক্ষণ কি? তার বিস্তার রোধ করার উপায় কি?

# চতুর্থ অধ্যায়

# সমাজ-কথা

## সামাজিক রীতি-শিক্ষা

### রীতিনীতি

মানুষ মিলেমিশে একসঙ্গে এক জায়গায় দল বেঁধে বাস করতে ভালবাসে। কেন ?

এক জায়গায় অনেক লোক বাস করলে, একের বিপদে-আপদে অন্যে সাহায্য করে, সকলের মঙ্গল আর স্নবিধার জন্য সকলে মিলে নানারকমের ব্যবস্থা করে। স্কুল, পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, পোস্ট অফিস, খেলাধুলার মাঠ প্রভৃতি স্থাপন করে। ধোপা, নাপিত, চাষী, তাঁতী, কামার, কুমোর, গয়লা, মুদী প্রভৃতি মিলেমিশে বাস করায় সকলের স্নবিধা হয়। এইভাবে একসঙ্গে এক জায়গায়, এক পাড়ায় বা গ্রামে বা দেশে যারা বাস করে, তাদের নিয়ে হয় সেই জায়গার, পাড়ার, গ্রামের বা দেশের **সমাজ**।

স্নতরাং তোমরা শুধু তোমাদের বাড়ির বা পরিবারের একটি লোক নও, তোমাদের পাড়া বা গ্রামের সমাজেরও একজন লোক। তোমাদের পাড়া বা গ্রামের আর সবাইও তোমাদের সমাজের এক-একজন মানুষ, সমাজের এক-একটি অংশ।

এই কারণে সমাজের মঙ্গলের জন্য আমরা কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবো, তার কতকগুলি নিয়মকানুন আছে। এই সব নিয়মকানুনকে বলে **সামাজিক রীতিনীতি** বা **ব্যবহার**।

## সৎ ব্যবহার

তোমরা জান, মা-বাবা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, কাকা-কাকীমা, দাদা-দিদি প্রভৃতিকে গুরুজন বলে। তোমরা তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। তেমনি ছোট ছোট ভাইবোনদের তোমরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে।



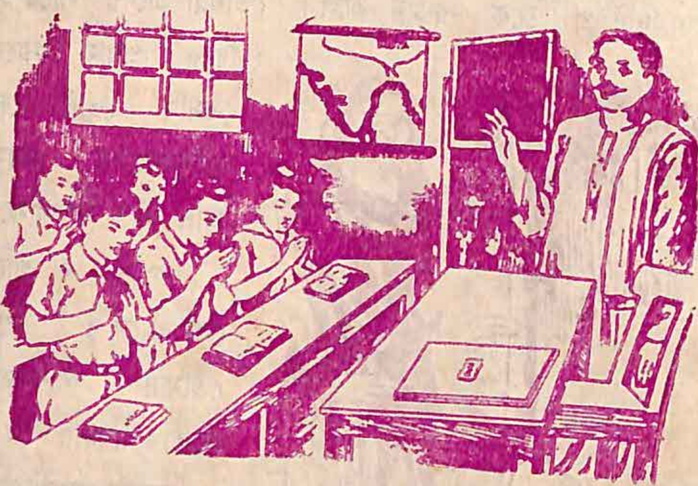
মাকে প্রণতি

পাড়ার বা গ্রামের লোকদের সঙ্গেও তোমরা আপনজনের মতো ব্যবহার করবে—বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করবে, ছোটদের ভালবাসবে।

শিক্ষকমহাশয় তোমাদের গুরুজন। শিক্ষকমহাশয় ক্লাসে এলে উঠে দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে তাঁকে নমস্কার করবে। তিনি বসলে বা তোমাদের বসতে বললে, তবেই তোমরা বসবে।

স্কুলে শিক্ষকমহাশয় যখন পড়াবেন, মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনবে। স্কুলের সহপাঠীদের ভাইবোনের মতো মনে করবে। তাদের মা-বাবাকেও সম্মান করবে।

ধোপা, নাপিত, গয়লা, পিওন প্রভৃতি সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। ভিখারী এলে তার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলবে।



শিক্ষক মহাশয়কে জোড়হাতে নমস্কার

তোমাদের বাড়িতে কাজকর্ম করার জন্য যদি মাইনে-করা লোকজন থাকে, তাদের সঙ্গে আপনজনের মতো ব্যবহার করবে।

## সামাজিক কাজ

যে কাজে সবার মঙ্গল হয়, তাকে **সামাজিক কাজ** বলে। মনে কর, তোমাদের পাড়ার বা গ্রামের কাঁচা রাস্তার একটা জায়গা নীচু, বর্ষাকালে সেখানে জল জমে কাদা হয়। তোমরা সবাই মিলে সেখানটা রাবিশ, ছাই বা মাটি দিয়ে ভরাট করে দিলে, তার ফলে তোমাদের ও সমাজের সকলের উপকার হলো।

কিন্তু মনে রেখ, দশজনে মিলে যেখানে কাজ করতে হয়,

সেখানে একজনকে নেতা করে, তার কথামত সকলকে কাজ করতে হয় ; নইলে কাজে বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল হয়।



সকলে মিলে রাস্তা মেরামত

যারা একসঙ্গে মিলে কোন কাজ করে, তারা সকলে পরস্পরের সাথী বা সহকর্মী। তোমরা যেমন তোমাদের সহপাঠী বা খেলার সাথীদের সঙ্গে ভাই বা বন্ধুর মতো ব্যবহার কর, সহকর্মীদের সঙ্গেও তেমনি ব্যবহার করবে।

## নিঃস্বার্থপরতা

অপরের অসুবিধা করে, নিজের সুবিধা করা অত্যন্ত অন্যায়। তাকে বলে স্বার্থপরতা। স্বার্থপর লোককে সবাই মন্দ বলে।

নিজের একটু অসুবিধা হলেও, যদি অপরের সুবিধা হয়, তাহলে সেই অসুবিধাটুকু সহ্য করেই কাজ করা উচিত।

ধর, তুমি কোন কাজে রেল স্টেশনে, দোকানে বা পোস্ট অফিসে গেছ। সেখানে গিয়ে তুমি সবার আগে জিনিস নেবার জন্য ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিলে। এ কাজ অত্যন্ত অন্যায়। যারা আগে এসেছে, তাদেরই আগে জিনিস পাওয়া উচিত। সুতরাং লাইনে দাঁড়িয়ে পরপর জিনিস নিতে অভ্যাস করা দরকার।

রাস্তায় আমের বা কলার খোসা বা কাঁটা বা এমন কিছু ফেলা উচিত নয়, যাতে কারো কোন কষ্ট বা অনিষ্ট হয়।



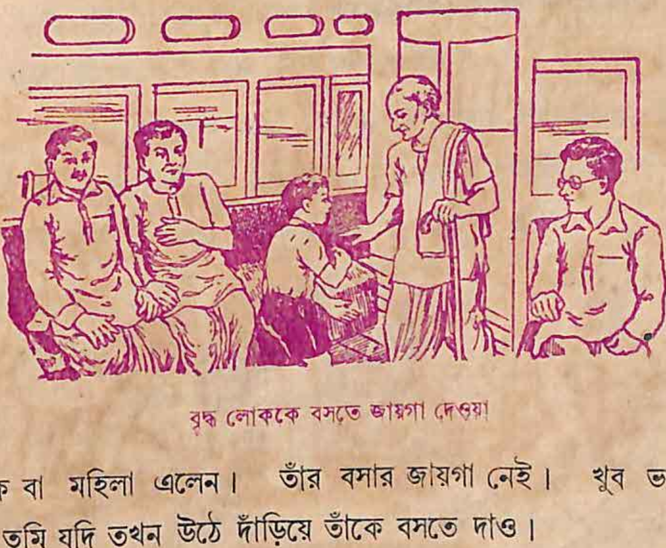
পাগলকে জ্বালাতন করা অন্যায়

অন্যায় কাজ নিজে কখনও করবে না। অন্যে করলে তাকেও বারণ করবে, মিষ্টি কথায় তার অন্যায় বুঝিয়ে দেবে।

অনেক দুষ্ট ছেলে রাস্তায় পাগল দেখলে, তাকে জ্বালাতন করে, ঢিল মারে। দুষ্ট ছেলেগুলিকে তোমরা বারণ করবে, মিষ্টি কথায় তাদের সেই অন্যায় বুঝিয়ে দেবে।

গরীব-দুঃখী, বুড়ো, অন্ধ-আতুর লোকদের প্রতি সব সময় সদয় ব্যবহার করা উচিত। কোন অন্ধ-আতুর রাস্তা পার হবার সময় সাহায্য চাইলে, তোমরা তাকে সাহায্য করবে। দেখবে, সে কত কৃতজ্ঞ হয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করবে।

মনে কর, তুমি রেলে বা বাসে চড়ে কোথাও চলেছ। তুমি বেঞ্চিতে বসে আছ। এমন সময় সেখানে হয়তো একজন বৃদ্ধ



বৃদ্ধ লোককে বসতে জায়গা দেওয়া

লোক বা মহিলা এলেন। তাঁর বসার জায়গা নেই। খুব ভাল হয়, তুমি যদি তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বসতে দাও।

সব শেষে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখবে, ভাল কাজ করে তা নিয়ে কখনো বড়াই করে বেড়িও না। তা করলে, কেউই তোমাদের উপর খুশী হবে না।

এই সব শিক্ষাগুলি তোমরা সব সময় মেনে চলার চেষ্টা করবে। তাহলে সমাজের মঙ্গল হবে। সবাই তোমাদের ভালবাসবে। তোমরাও সুখী হবে, মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে।

## অনুশীলনী

১। সমাজ কাকে বলে? সামাজিক রীতিনীতি কাকে বলে? সমাজের মঙ্গল হলে সকলেরই মঙ্গল হয় কিভাবে?

২। সৎ ব্যবহার কাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

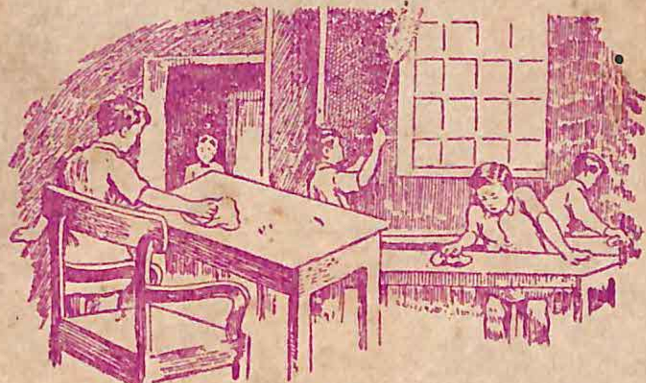
৩। যে কেবল নিজের সুবিধা দেখে, তাকে কি বলে? লাইনে দাঁড়িয়ে জিনিস কেনা অভ্যাস করা দরকার কেন? অন্ধ-আতুরদের প্রতি সদয় ব্যবহারের একটা উদাহরণ দাও। গাড়িতে যেতে লোকের সঙ্গে সৎ ব্যবহারের একটা উদাহরণ দাও।

# সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা

গোড়ার দিকে তোমরা নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষার কথা পড়েছ। কিন্তু সমাজের সকলের স্বাস্থ্য কিভাবে রক্ষা করা যায়, তা-ও তোমাদের জানা দরকার।

গ্রামে যদি পচা খানা-ডোবা, ঝোপ-জঙ্গল বেশী থাকে, তাহলে গ্রামের সকলের মতো তোমারও স্বাস্থ্যহানি হয়। সেইজন্য সকলে মিলে সেসব সাফ করে ফেলতে হয়।

পাড়ার পথঘাট যদি নোংরা আবর্জনায় ভরা থাকে, তাহলে সবারই স্বাস্থ্যহানির ভয় থাকে। তাই সবারই উচিত এক-যোগে গ্রাম বা পাড়া পরিষ্কার করা ও পরিষ্কার রাখা।



স্কুল পরিষ্কার রাখা

পাড়ায় কারো কোন রোগ হলে, তার জীবাণু যাতে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সে দিকে সবারই বিশেষ নজর রাখা উচিত। রোগ ছড়িয়ে পড়লে, গ্রামের সবারই বিপদ।

ঠিক তেমনি, যে স্কুলে তোমরা পড়, সে স্কুলকেও সকলে মিলে পরিষ্কার রাখতে হবে। তুমি নিজে কখনও কোনভাবে স্কুলকে নোংরা করবে না এবং আর সব ছেলেমেয়েদেরও স্কুল নোংরা করতে বারণ করবে। সবাই মিলে মাঝে-মাঝে স্কুলবাড়ি, স্কুলের বাগান ও খেলার মাঠ খুব করে পরিষ্কার করবে।

## অনুশীলনী

১। সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা কাকে বলে? সামাজিক স্বাস্থ্যহানি হয় কি কি কারণে? সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কি রকমের কাজ করতে হয়?

